



## মধুর অবকাশ...

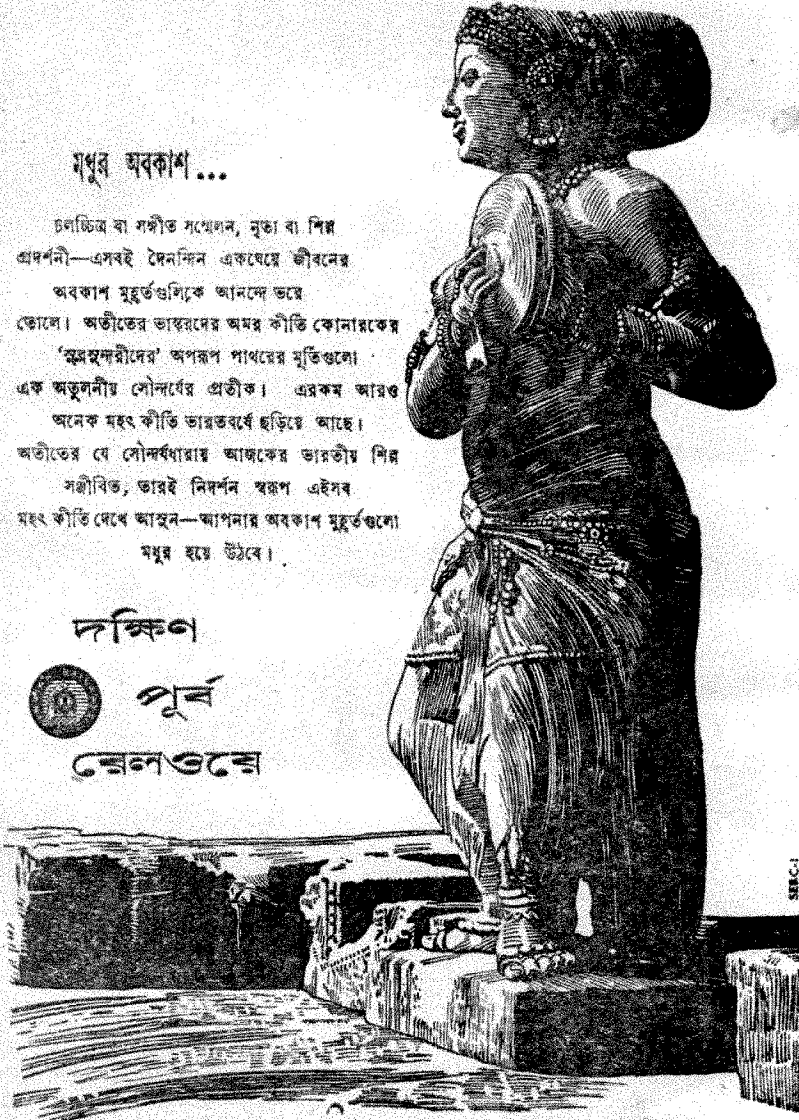
চলচ্চিত্র বা সঙ্গীত সংযোগন, মুক্তা বা শির  
প্রদর্শনী—এসবই দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনের  
অবকাশ মুহূর্তগুলিকে আনন্দে ভরে  
তোলে। অতীতের ভাব্যদের অমর কীতি কোনারকর  
'স্মরণস্মরীদের' অপূরণ পাথরের মূর্তিগুলো  
এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের প্রতীক। এরকম আরও  
অনেক মহৎ কীতি ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে।  
অতীতের যে সৌন্দর্যধারার আভ্যন্তর ভারতীয় শিল্প  
সঙ্গীভিত্ত, তারই নিদর্শন স্বরূপ এইসব  
মহৎ কীতি দেখে আশুন—আপনার অবকাশ মুহূর্তগুলো  
মধুর হয়ে উঠবে।

দক্ষিণ



পূর্ব

স্বদেশে



SEC-1

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা

বৰ্ষ ৬৬ ॥ সংখ্যা ১

## সূচীপত্ৰ

|                                |                         |    |
|--------------------------------|-------------------------|----|
| অসমীয়া শাক্ত সাহিত্য          | শ্ৰীশশিভূষণ দাশগুপ্ত    | ১  |
| হিম্মি ভাষাৰ কথা               | শ্ৰীবিষ্ণুপদ ভট্টাচাৰ্য | ১৯ |
| বিনাথ শাস্ত্ৰীৰ কবিতা          | শ্ৰীভবতোষ দত্ত          | ৩২ |
| শ্ৰীনিবাস-নরোত্তমের কালনির্ণয় | শ্ৰীবিমানবিহারী মজুমদার | ৪২ |

ম ও স্বরলিপি

৫০

## চিত্ৰসূচী

শবনাথ শাস্ত্ৰী

১

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা। বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

পরিষদের সঙ্কল্প-পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য।

১৩০৪০৭

আহারের পর  
দিনে দু'বার..

দ্রব প্রাণুতে  
খাদ্য লীড়ের  
শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসজীবনী সজে চার চামচ মহা-  
ড্রাক্সারিট ( ৬ বৎসরের পুরাতন ) সেবনে আপনাদের  
খাদ্যের ক্ষমতা উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-  
ড্রাক্সারিট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কালি,  
শ্বাস শ্রদ্ধতি রোগ নিবারণ করিতে অত্যধিক  
ক্ষমপ্রদ। মৃতসজীবনী দুধ ও হজমশক্তি বর্ধক ও  
বলকারক টনিক দু'টি ঔষধ একত্রে সেবনে  
আপনাদের দেহের শক্তি ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, কমে  
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং মলমল  
বাহ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

মৃত স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান



**সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা**

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নবেশ চন্দ্র  
খোব, এম.বি.বি-এস, আর.জেনেব-  
আচার্য, ৩৬, পোতা ল পাড়া  
রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ বোধেশ চন্দ্র খোব, এম.এ.  
আই.জেনেব, এল.সি.এস. (মেড.),  
এম.পি.এল (আবেদিকা), ডাঃ পদমুখ  
কলেজের ইন্টারনাল পাত্রের স্বত্বস্বীকার  
অধ্যাপক।



বীণেশ্বর/মাস্ত্রী

জন্ম ৩১ জানুয়ারি ১৮৪৭

মৃত্যু ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৯

## অসমীয়া শাক্ত সাহিত্য

### শ্রীশশিন্দুৰণ দাশগুপ্ত

অসমীয়া সাহিত্যের শাক্ত সাহিত্যের অল্পসন্ধান করিলে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাহাকে ছিটেফোটা বলা যায়। কিন্তু এক দিক হইতে বিচার করিলে রূপারটা কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। শক্তিপীঠ-রূপে আসামের অন্তর্বর্তী কামৰূপের অত্যন্ত প্রসিদ্ধি। কালিকা-পূৰাণ, বৃহদ্রম-পূৰাণ, দেবী-ভাগবত, কুজিকা-তন্ত্র, যোগিনী-তন্ত্র, চুড়ামণি-তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে নানাভাবে কামৰূপের কামাখ্যা দেবীর উল্লেখ ও মহিমা-কীর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পূৰাণ-তন্ত্রগুলি খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না; এগুলির কোনখানিই দশম শতকের পূর্ববর্তী কালে রচিত নয়। মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় দশম শতক হইতে কামৰূপের শক্তিপীঠ-রূপে খ্যাতি। বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে দেখিতে পাই, দেহমধ্যস্থ চারিটি কায় বা চারিটি চক্রকে চারিটি পীঠ বলা হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্র ‘সাধনমালা’র মতে এই চারি পীঠ হইল— উড্ডীয়ান, পূৰ্ণগিরি, শ্রীহট্ট এবং কামৰূপ। চৰ্যাপদের চতুর্থ সংখ্যক পদের—

দিবসই বহুড়ী কাকভয়ে রাএ।

রাতি ভইলে কামৰূপাএ।

ইহার ভিতরকার ‘কামৰূপ’ শব্দের অর্থ অনেকেই কামৰূপ বলিয়া গ্রহণ করেন। চৰ্যাপুলি দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বলিয়া গৃহীত— এই সময়ে তাহা হইলে কামৰূপের তাম্রিক-সাধনার পীঠ রূপে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। কামৰূপ দেবীর যোনি-পীঠ বলিয়া খ্যাত। যোনি-পীঠের ব্যাখ্যা এখন দেবীর একান্ত অঙ্গ-পতনের সহিত একান্ত পীঠের উদ্ভবের কাহিনীদ্বারা করা হইয়া থাকে। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মনে হয়, এই যোনি-পীঠের-প্রসিদ্ধিদ্বারা বোঝা যায়, এই পীঠটি এক সময়ে তন্ত্র-সাধনার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখন পর্যন্তও আসামের বাহির হইতে বহু শাক্ত-সাধক এবং গৃহী-ভক্ত লে দলে এই শক্তিপীঠে তীর্থ করিতে আসেন। অনুব্রাতী উপলক্ষ্য করিয়া এখানে এখনও বহু সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

যে-আসামের প্রায় কেন্দ্রস্থলে কামৰূপের এই শক্তিপীঠ কামাখ্যা এবং সমগ্র পূর্বভারতে যে শক্তিপীঠ কামাখ্যার এত প্রসিদ্ধি সেই আসামের ধর্ম, সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে শক্তিবাদের প্রভাব নানাভাবে থাকিবার কথা ছিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাহা তেমন কিছুই নাই। ইহার কারণ কি? কারণ স্পষ্টভাবে কিছু বলা শক্ত; তবে কতকগুলি কথা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে হইয়াছে। প্রথমতঃ মনে হয়, কামৰূপের

কামাখ্যা তীর্থ প্রথমাধি গুহ্য তন্ত্রসাধনারই একটি কেন্দ্র ছিল। গুহ্য তন্ত্রসাধনা কোনও জনপ্রিয় ধর্ম নয়, ইহা সর্বদাই একটি বিশেষ সাধক-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এইজন্যই কামাখ্যাপীঠকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম তাহার জনসাধারণের মধ্যে কোনও প্রসিদ্ধি ছিল না। বাঙলাদেশের শাক্তধর্ম যে রূপে প্রসিদ্ধ সাধকগণের ধ্যান-সাধনার ভিতর দিয়া সাম্প্রদায়িক সীমা অতিক্রম করিয়া সার্বজনীন ধর্মের রূপে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে পারিয়াছিল, কামরূপের সাধনা তাহা কখনই পারে নাই।

আর-একটি লক্ষণীয় তথ্য এই, তীর্থরূপে কামরূপ অসমীয়াগণের নিকটে কিন্তু খুব প্রিয় তীর্থ নহে। এখন পর্যন্ত দেখা যায়, কামরূপ তীর্থের যাত্রী মুখ্যতঃ বাঙালী— বি- কিছু বিহারের প্রত্যন্তবাসী, স্থানীয় যাত্রীর ভিড় খুব কম।

তবে অসমীয়া সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে শক্তিবাদের প্রভাবের অল্পপস্থিতির সর্বপ্রধান কারণ মনে হয়, শঙ্করদেবের আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচার। শঙ্করদেব ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৬৮ সনে তিনি দেহরক্ষা করেন। এই দীর্ঘজীবনে তিনি সমস্ত আসামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার ভাগবত-ধর্ম এবং ‘নামঘোষা’ সাধনার প্রচার করেন এবং এ-বিষয়ে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেন। তিনি অসমীয়া ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং এ-কথা বলা যায় যে, সাহিত্যের দিক হইতেও তাঁহার দীর্ঘজীবনের বিপুল সাধনাই অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্য রূপে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শঙ্করদেবের এমনই একটা সর্বাতিশয়ী প্রভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার পরে রামায়ণ-মহাভারত এবং বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র ও বৈষ্ণব সংগীত ব্যতীত আর তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য শাক্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

অবশ্য জাতিগত উত্তরাধিকার-রূপে ভারতীয় শক্তিবাদের পরোক্ষ প্রভাব শঙ্করদেবের কিছু লেখাতেও আবিষ্কার করা যায়। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, ‘সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের সর্বত্রই একটি বিশেষ ভঙ্গিতে শক্তিবাদের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা শুধু বাঙলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় সব আঞ্চলিক সাহিত্যেই। ভারতীয় পুরাণাদির মধ্যে এই বর্ণনার মূল নিহিত আছে, এই ঐতিহ্যই সকল আঞ্চলিক সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছে। শঙ্করদেব-রচিত ‘অনাদি পাতনে’র মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা রহিয়াছে, সেই বর্ণনার সহিত বাঙলা ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনার মোটামুটি ঐক্য রহিয়াছে। শক্তিবাদ ও সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিবাদ মিশ্রিত হইয়া এই সৃষ্টিতত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। ‘অনাদি পাতনে’ও দেখি, সৃষ্টির পূর্বে—

মহা প্রকৃতিয়ো পুরুষতে ভৈল লীন।

ন থাকিল আন একো পুরুষতো ভিন।

নাহি জল নাহি স্থল নাহিকে আকাশ।

নাহি মহা বায়ু চন্দ্র সূর্যর প্রকাশ।

• লেখকের *Obscure Religious Cults* গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য

নাহি নীত উষ্ণ ঋতু নাহি ব্ৰাহ্মি দিন ।

সমস্তে সংসার গৈল ঈশ্বরভ লীন ॥<sup>২</sup>

জ্ঞানময় আনন্দযুতি নিরঞ্জন ব্রহ্ম নয়নকমল মুদ্রিত করিয়া ষোণনিভ্রায় ‘আপোনাকে চিন্তি মাত্ৰ আছন্ত কেবল’। অনেক সহস্ৰ যুগ এইভাবে চলিয়া গেলে ‘ছনাই ঈশ্বর’ সৃষ্টিৰ জন্ত ইচ্ছা হইল এবং তিনি ভাবিলেন, ‘মায়ার হাতত কৰাও জগত প্ৰকাশ’। তখন—

এহি বুলি মেলি পদ্ম নয়ন অনন্তে ।

মায়াক কটাক্ষে চাহিলন্ত ভগবন্তে ॥

জর প্রকৃতিত করিলন্ত জীৱ দান ।

অষ্ট গুণে ভেজ বোল গুণে ভৈল প্রাণ ॥

সৃষ্টি করিবাক ঈশ্বর ইচ্ছা কাজ ।

পুরুষৰ পৰা মহামায়া ভৈল বাজ ॥

অনাদি ৰূপিণী ঈশ্বর অৰ্ধকায ।

ব্যক্ত ভৈলা মহামায়া সৃষ্টিক ইচ্ছায় ॥

পরমা সুন্দরী নারী বিধা দেবী বেশ ।

কটাক্ষত মোহ যাই জগত নিঃশেষ ॥

...

চাহিবাক নপারি দেবীর মহা জ্যোতি ।

কোটি এক সূৰ্য যেন প্ৰকাশে প্ৰকৃতি ॥

পুরুষকে প্ৰণাম কৰিয়া মহামায়া তখন কৃতাজলিপুটে বিনয়বচনে বলিলেন—‘কোন কৰ্ম কৰো আবে কৰিয়ো আদেশ’। একথা শুনিয়া নিরঞ্জন পুরুষ ঋষিকেশ হাসিয়া বলিলেন,—

শুনিয়ে প্ৰকৃতি একগুণে নোহা হীম ।

তোমাৰে আমাৰে কিঞ্চিতেকো নাহি ভিন ॥

মোর নিজ শক্তি সম্যকে দেখো প্রাণ ।

সম্বৰে কৰিয়ো মায়া জগত নিৰ্মাণ ॥

তোমাক চেতাইলো আমি এই অভিপ্ৰায় ।

জানিলোক ভালে তুমি মোৰ অৰ্ধকায ॥

তোমাৰে আমাৰে একো নাহি ভিন্নাভিন্ন ।

মোতে যাতে লীন যাহা এহি খানি হীম ॥

সম্বৰে কৰিয়ো মায়া জগত প্ৰকাশ ।

কৰো সৃষ্টি লীলা তাতে বিনোদ বিলাস ॥

এই যুগে হর-গৌরীকে লইয়া যে অসমীয়া সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল রামসরস্বতী-রচিত ‘ভীমচরিত’। রামসরস্বতী শঙ্করদেবের সমসাময়িক বলিয়া গৃহীত। কবিচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, ভারতভূষণ এবং রামসরস্বতী সবই তাহার পরবর্তী কালের পাণ্ডয়া নাম বা উপাধি। এই কবি-রচিত ‘ভীমচরিত’ নানা দিক হইতে কোতূহলোদ্দীপক। আমরা বাঙলা সাহিত্যে ক্লষক শিবের উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া শিব-গৃহিণী গৌরীর যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাব বিশদ বর্ণনা শিবায়নকাব্যে পাই।<sup>৩</sup> দরিদ্র ক্লষক শিবের ঘবণী-রূপে দেবীর চিত্রকে আবার খানিকটা একটু নূতন রূপে পাইতেছি রামসরস্বতীর কাব্যের মধ্যে। বেশ বোঝা যায়, বাঙালী কবিগণ এবং অসমীয়া কবি এক আকর হইতেই মূল উপাখ্যান পাইয়াছেন; কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলেব কবি তাহাতে বিভিন্ন রঙ চড়াইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, বাংলা ‘শূন্তপুরাণে’ এবং অন্যান্য শিবায়ন কাব্যগুলিতে শিবের বিখ্যস্ত অমুচর হইলেন জনৈক ‘ভীম’। কবি রামসরস্বতী শিবের বশব্দ ভূত্য এই ভীমকে মহাভারতের পাণ্ডুপুত্র ভীমের সহিত অভিন্ন করিয়া লইয়াছেন। পাণ্ডুপুত্র ভীমই আসিয়া কৈলাসে শিবের ভূত্যত্ব স্বীকার করিয়া-ছিলেন। কারণস্বরূপ কাব্যখানির প্রথমেই দেখিতেছি, অন্নর দুঃখে ভীমের শরীর একেবারে শীর্ণ—

একদিনা ভীমে বোলে রাজ্যার আগত।

শুকাই গৈলেক দেহা অন্নর দুঃখত ॥

মেলানি দিয়োক দাদা কৈলাশক ষাও।

মহাদেউর গরু চারি প্রাণ প্রবর্তাও ॥<sup>৪</sup>

খাইতে না পাইয়া ভীম যুধিষ্ঠির রাজ্যার নিকট বলিলেন—‘অন্নর দুঃখে তো দেহ শুকাইয়া গেল। বিদায় দাও দাদা, একবার কৈলাসে যাই; সেখানে মহাদেবের গোরু চরাইয়া প্রাণ বাঁচাই।’ যুধিষ্ঠিরাদিও উপায়ান্তর তেমন কিছু না দেখিতে পাইয়া ভীমকে বিদায় দিলেন। ভীম কৈলাসে গিয়া শিবের পায়ে দণ্ডবৎ হইয়া ‘গরু চারি থাকিবোহঁ তোমার আলম’—এই ইচ্ছা প্রকাশ করিল। শিব বলিলেন—‘বেশ ভালই হইল; কার্তিক-গণেশ দুই ছেলেমানুষ বৃষ চরায়—তুমি তাহাদেব লইয়া বৃষ চরাও।’ মা পার্বতী আসিয়া এ-কথা শুনিয়া খুশী হইলেন। তিনি ভীমকে বলিলেন—

পার্বতী বোলয় শিশু মোর ঘরে থাক।

যতেক লাগয় মানে অন্ন দিব তোক ॥

এগুটি বলদ জানা মোহোর ঘরত।

১ কার্তিক গণপতি দুয়ো চাবিবে লগত ॥

৩. রামকৃষ্ণ ও বামেশ্বরের শিবায়ন দ্রষ্টব্য

৪. অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম খণ্ড

ভীম অতি স্পষ্টবাদী, সে বলিল, এখন যে আমাকে রাখিব— ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখিও—  
'পাছে জানো বোলা ইটো বহু ভাত খাই' ! কিন্তু—

হেন শুনি পার্বতীয়ে তুলিলেক হাস ।

টিপ্‌চি গোটে নো তই কত ভাত খাস ।

চৌষষ্ঠি যোগিনী খায় আৰু ভূতগণ ।

তোক লাগি আমাৰাৰ হুজুৰিবে অন্ন ॥

ভীম বলিল—‘আই, তোমাকে কথাটা ভাঙিয়াই বলিতেছি, খাইবার পরিমাণটা আমার একটু বেশি, নিত্য আমার ভাত লাগে ‘সাত সাকি’, আব ব্যঞ্জন লাগে ‘নাও সাত কুন্দা’। তোমার ত দেখিতেছি ভাতা ঘৰ, ফাটা বুলি—আব ‘ঘৰ মাঝে নাই দেখোঁ গোটা চাৰি ধান’। শিবের যা অবস্থা দেখিলাম— বস্ত্র নাই, ধন নাই— মুণ্ডমালা আর সৰ্পভূষণ। মাথায় তেল নাই— চুল জটা বাধিয়া গিয়াছে, গায়ে গন্ধ— ‘ভিক্ষা অঙ্গে পেট পোষে শব্দৰ গোসাঁই’ ! ছোটমুখে বড় কথা শুনিয়া—

পার্বতী বোলয় শিশু গুটি বর টালি ।

পরশুর কথা কহ কালিয় ছবালী ।

অগতের ধন ধান্ধ সকল আমার ।

আমা করি কোন আর দেব আছে চার ॥

ভীম বলিল—‘আই, অতশত কথা বুঝি না, আমার এক কথা—‘পাছকালে খেদাইবাক ন পারিবা মোক’।’ যাক, ভীম শিবের বুধরক্ষণে নিযুক্ত হইয়া বুধ লইয়া কাৰ্তিক-গণেশসহ কৈলাসশিখরে চলিয়া গেল। সেখানে ঘাসের মধ্যে বুধ বাঁধিয়া রাখিয়া কাৰ্তিক-গণেশসহ ভীম গেল গাছের ভাল ভাল ফল খাইতে। ইতিমধ্যে বুধ ভাল ভূণের লোভ পাইয়া গিয়া বেড়া ভাঙিয়া ঢুকিয়া পড়িল বিখামিত্র ঋষির ‘মধুবনে’— এবং বন ভাঙিয়া তচনচ্‌ করিয়া দিল। ভীম কাৰ্তিক-গণেশসহ সেখানে আসিয়া ঋষির রুদ্রমূৰ্তি দেখিয়া যত দোষ বুধের ঘাড়ে চাপাইল, এবং বুধের লেজ ধরিয়া এক ঘুরপাক দিয়া তাহাকে আধমরা করিয়া ফেলিল। বুধটি মৃত মনে করিয়া ভীম বুধবধের দোষ প্রথমে কাৰ্তিক-গণেশের ঘাড়ে চাপাইল— পরে বিখামিত্র ঋষির ঘাড়েই চাপাইল। ভীমকে দেখিয়া সকলেরই মনে হইল, ‘নজানো কোথের ইটো পরম দুৰ্জন !’ যাহা হোক, ভীম শেষ পৰ্ব্বস্ত বুধ লইয়া বাড়ি ফিরিল— বাড়ি ফিরিয়া পূৰ্বচুক্তি অনুসারে খাইতে বসিল। ভীমকে খালা ভরিয়া ভাত দেওয়া হইল, কিন্তু ‘এক গ্রাসে ভীমে তাক পেলাইলেক খাই’। ভীমকে ভাত দিয়া ব্যঞ্জন আনিতে গেলে দেবী ফিরিয়া আসিয়া দেখেন ভাত নাই— ব্যঞ্জন দিয়া ভাত লইয়া ফিরিয়া দেখেন ব্যঞ্জন নাই। দেবী যতই ভাত-ব্যঞ্জন দিতেছেন ততই—

ভাক দিয়া ভীমে বোলে শুনিয়োক আই ।

আৰু ভাত আনা মোর ভোক নপলাই ॥

কিন্তু এ দিকে তাঁড়ার যে একেবারে উজাড়! দেবী ভাত আনতে ঘরে ঢুকিয়া আর ফিরিলেন না—

ভাত নাই দেখি দেবী ওলাই নাসিলা।

অসন্তোষে ভীম ঘাই আচাস্ত করিলা ॥

কিন্তু ভীমের ক্ষুধা যায় না—দেবীকে বলিল, ‘ঝুলিতে চাউল খুঁ কিছু আছে?’ কিন্তু হেন শুনি পার্বতীয়ে বুলিলা বচন।

আজি বাপু মোর ঘরে নাই খুদকণ ॥

ভীম তখন ক্ষেপিয়া গেল, বলিল, খালি পেটে সে আর গোরু চরাইতে পারিবে না। সে আরও বিজ্ঞপ কবিয়া বলিল, পার্বতীর ঘরে ভাত নাই—কেবল ভাঙ খাইয়া জীবনধারণ, এবং ‘খাইবে নপাই শিবে ফুরে ডম্বর বাজাই’! ভীমের বচনে দেবী পার্বতী বড় লজ্জা পাইলেন, তিনি গিয়া মহাদেবকে ধরিয়া বলিলেন,—

পার্বতী বদতি প্রভু শুনা জ্বিলোচন।

একবার কিরিশি করিবে দিয়া মন ॥

ভিক্ষাব চাউলে জানা পেট ছুপুয় ॥

খাইবে নাপাই গবখীয়া আরাব করয় ॥

পার্বতীর বাক্য শুনিয়া শিব বলিলেন—‘গুরু কৃষিকর্ম আমি কিভাবে করিব?’—

দ্রুতর কৃষিক মই করিবো কিমত।

নাই কড়াকড়ি ধন মোহর ঘবত ॥

ইহাব উত্তরে পার্বতী শিবকে যে কথা বলিলেন তাহা একটি সংস্কৃত শ্লোকের সহিত ছবছ মিলিয়া যায়; এবং আমরা বাঙলা শিবায়ন কাব্যে এক্ষেত্রে পার্বতীর যে উক্তি দেখিতে পাই তাহার সহিত আশ্চর্যভাবে মিলিয়া যাইতেছে।

পার্বতী বদতি প্রভু ভয় এরা মনে।

মাটি খুঁজি লোহা কিছু বাসবব স্থানে ॥

কঠিয়া আনাহা খুঁজি সখি কুবেরত।

নাঙ্গল আনাহা খুঁজি বলো যে ভদ্রত ॥

যমর মহিষ গোট আনিয়োক ঘাই।

তোমাব বৃষভ আছে করা এক ঠাই ॥

ত্রিশূলক ফাল করি হালক জুরিয়ো।

এহি মতে কৃষিকার্য বিধান করিয়ো ॥

পার্বতীর বাক্য শিব গ্রহণ করিলেন, সব জ্বিনিস যোগাড় হইল, শিব হাল চাষলেন এবং ‘বৈলা বিধে বিধে ধান সব কৃষ্টিবাস’। দেখিতে দেখিতে মাঠ ভরিয়া ভাল ধান হইল।

শিব একদিন পাৰ্বতীকে ডাকিয়া কখনও ধানেব মাঠে বাইতে নিষেধ কৰিলেন ; কিন্তু নিষেধ শুনিয়া পাৰ্বতীৰ কোতুহল বাড়িল, গোপনে একা একা একদিন মাঠে গেলেন। মাঠভৰা পাকা ধান দেখিয়া শিবের কাৰ্বে দেবী আশ্চৰ্য হইয়া গেলেন— এবং ‘উশ্ আশ্ এই দুই উচাৰিল বাণী’, কিন্তু কি কাণ্ড— এই দুই ‘বাণী’ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া সব পাকা ধান পুড়িয়া ফেলিল ; ভয় পাইয়া পাৰ্বতী পলাইয়া আসিলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কিন্তু শিব গিয়া একদিন সব দেখিলেন। সব পাৰ্বতীৰ কাৰ্য বুজিয়া ঘৰে ফিৰিয়া আসিয়া ‘বিস্তৰ টঙ্কিল’। তখন—

পাৰ্বতী বদতি প্রভু গৈলার্হো হঠং ।

পুৱিলেক ধানখান দেখিলোঁ সাক্ষাত ॥

চরণত ধরো প্রভু দোষ মরষিযো ।

আরু একবার প্রভু খেতিক কৰিয়ো ॥

শঙ্কর আবার ধান কুইলেন— আবার প্রচুর ধান হইল। অবশ্য ভীমকে লইয়া ধানকাটা ব্যাপারে আরও কিছু গোলমাল হইল— কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত ‘কিছু আছ কিছু ভৈলা শালী’।

আসামে এখনও বিবাহের তিনদিন পৰে নব-বিবাহিত বরবধূকে এই ‘ভীমচরিত’ শুনাইবার প্রথা বৰ্তমান আছে। দেবীৰ ‘উশ্ আশ্’ এই দুই বাণী হইতে ‘হাহা’ ও ‘ছহ’ এই দুই দৈত্যের কল্পনা করা হয় ; গ্রাম্য বিশ্বাসে ইহাবাহি শিবের শস্ত গ্রাস কৰিয়াছিল ; শস্ত যখন পুনরুজ্জীৱিত কৰা হইল তখন ঠিক হইল, এই ‘হাহা-ছহ’ আর মাঠের শস্ত না খাইয়া নব-বিবাহিত বরকন্ডাৱ রক্ত খাইবে। গ্রাম্য বিশ্বাস, বিবাহের তিন দিন পরে বরবধূকে এই কাহিনী শুনাইয়া দিলে দৈত্যদ্বয় তাহাদের আর কোনও অপকাৰ কৰিতে পারে না।

অসমীয়া সাহিত্যে মধ্যযুগের বাঙলা মঙ্গল-কাব্যের অল্পৰূপ কিছু কিছু মনসা-মঙ্গল পাওয়া যায়। এ-যাবৎ তিন জন কবির মনসা-মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, কবি মনকর ( ১৫শ শতক ), কবি দুৰ্গাবর ( ১৬শ শতক ) এবং ‘স্ককনানি’। এই তৃতীয় কবি ‘স্ককনানি’ হইলেন স্ককবি নারায়ণ দেব। ইনি যৈমনসিংহবাসী বাঙালী কবি হইলেও তাঁহার মনসা-মঙ্গলেব আসামের বহু স্থানে খুব প্ৰসিদ্ধি এবং তিনিও একজন অসমীয়া কবি বলিয়াই আসামে প্ৰসিদ্ধ।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রুচিনাথ কবি এবং রজনাত কবি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীৰ অসমীয়া ভাষায় অল্পবাদ কৰিয়াছিল। কবি রজনাত দ্বিজ তাঁহার যে আত্মপৰিচয় দিয়াছেন তাহাতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় যে কবি কামাখ্যাৰ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পূৰ্বপুৰুষ কামাখ্যা দেবীৰ পৰমভক্ত শিবচন্দ্ৰের পৰিচয়প্ৰসঙ্গে কবি নীলগিৰি-পৰ্বত এবং কামাখ্যা দেবীৰও বৰ্ণনা কৰিয়াছেন।

গিৰি মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ সিতো নীলগিৰি বড়।

ফুলে ফুলে জাতিস্কাৰ দেখিতে হুন্দর ॥

অনেক মণ্ডপগণ ষাহাত আছয় ।  
 চন্দ্রব সদৃশ সবে প্রকাশ করয় ।  
 সৌভাগ্য আছয় তাত পাপ বিমোচন ।  
 কামাখ্যা গোসানী আছে আনো দেবগণ ।  
 সেহি পুণ্য ভূমি জানা জগতর সার ।  
 পৃথিবী মণ্ডলে তার সম নাহি আর ।  
 দ্বিজগণ আছে তাত সবে শুদ্ধ মতি ।  
 দুর্গার চরণে সন্না করন্ত ভকতি ॥  
 মহাস্বখে থাকি বিপ্র সেহি পর্বতত ।  
 করিলা ভকতি কামাখ্যার চরণত ॥\*

শিবচন্দ্রের ভক্তি এতই গাঢ় এবং বিশ্বাস ছিল যে দেবী ভগবতী কামাখ্যা মাত্র তাঁহার প্রতি অতিশয় সদয় হইলেন এবং প্রত্যহই দেবী একবার আসিয়া ভক্ত শিবচন্দ্রকে সাক্ষাতে দেখা দিতেন । এই সংবাদ জানিয়া কামরূপ-অধিপতি ধর্মপতি আসিয়া শিবচন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন, মাকে একবার সাক্ষাতে দেখাইতে হইবে । শিবচন্দ্র স্বীকার করিলেন । তাঁহার পরে—

বিধিরতে ব্রাহ্মণে পূজিলা নানা মত ।  
 পূর্বরতে দেবী আসি ভৈলন্ত বেকত ॥  
 সিবেলা সাক্ষাতে রাজা দেবীক দেখিলা ।  
 রাজাই দেখিলা হেন দেবীয়ে জানিলা ॥  
 কোষদৃষ্টি চাহি পাছে ব্রাহ্মণক প্রতি ।  
 ভেতিক্ষণে অন্তর্ধ্যানে ভৈলা ভগবতী ॥

‘গোসানী’র কোষদৃষ্টিতে শিবচন্দ্র কালো বর্ণ এবং ইদ্র-মস্তক হইলেন এবং এইজন্তই তাঁহার নাম হইল ‘কেন্দুকালে’ ।

দ্বিজ রত্ননাথ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, মূলকে অনেকখানি সংক্ষেপ করিয়া নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন । তবে তাঁহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনেক সময়ই মূলকে স্মরণ করাইয়া দেয় । স্থানে স্থানে বর্ণনা মূলের অনুরূপই । যেমন দেবতাগণের দেহজাত তেজসমূহ ঘনীভূত হইয়া যখন দেবীরূপ পরিগ্রহ করিল তখনকার বর্ণনা এইরূপ—

সবে দেবতার তেজ ভৈলা একস্থান ।  
 আতি উচ্চ পুঞ্জ তেজ পর্বত সমান ॥  
 দেখে দেবগণে তাতে সেহি তেজচয় ।  
 জলন্তে আছয় যেন কোটি সূর্যময় ॥

জালায়ে ব্যাপিছে সবে দিগ নিরন্তর ।  
 নাহিকে তন্তুল্য আতিশয় ভয়ঙ্কর ।  
 চাহিবে নোৱাৰি তেজ আতি ভয়ানক ।  
 কাস্তিয়ে ব্যাপিলা তার তিনিও লোকক ॥  
 একঠাই হয় সবে দেবতেজ চয় ।  
 ভৈলা এক গোটা নারী পরম বিনয় ॥

ইহা মূলের—

অতীব তেজসঃ কূটং জলন্তমিব পর্বতম্ ।  
 দদৃশুস্তে স্ৱাস্তজ্জ জালাব্যাপ্তদিগন্তরম্ ॥  
 অতুলং তজ্জ তেজঃ সৰ্বদেবশরীরজম্ ।  
 একস্থং তদভ্ৰমারী ব্যাপ্তলোকজয়ং স্থিষা ॥

প্রভৃতিরই নিকট অলুসরণ। কিন্তু কবি স্থানে স্থানে স্বাধীনতাও গ্রহণ করিয়াছেন। চণ্ডিকার রূপেব কথা শুনিয়া শুভ-নিশুভ লুপ্ত হইয়াছিল এবং চণ্ডিকাকে কামনা করিয়াছিল; কিন্তু রত্ননাথের চণ্ডীতে দেখিতে পাই চণ্ডিকাব মনোমোহিনী মূর্তি দেখিয়া মহিষাসুরই যুদ্ধস্থলে চণ্ডিকাকে কামনা করিয়াছিল। এহলে চণ্ডিকার রূপের বঙ্গনাথ যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাকে আমরা বিবিধ বাঙলা মঙ্গলকাব্যে দেবীর রমণীয় মূর্তির যে বর্ণনা পাই তাহার সহিত একসঙ্গে তুলনা করিতে পরি।

গোসানীর দেখি অঙ্গ মহিষর ভৈলা রঙ্গ  
 হাসিয়া বোলয় স্তন রামা ।  
 তোহোর বদন শোভে তরুণর মন লোভে  
 নবীন (৭) বিহিন হিম ধামা ॥  
 নব পুতলি তল্ল ক্রুর যুগ মদনর ধল্ল  
 নাসা তোর তিল ফুল জিনি ।  
 ছারিয়া মুরতি বেশ কেনে যুদ্ধ অভিলাষ  
 আপুনাক আবে অভাগিনী ॥  
 অধর বন্দুলি যেন প্রকাশয় বিতোপন  
 পক্ষ ডারিয়র বীজ দস্ত ।  
 নয়ন খঞ্জন নয় দীৰ্ঘ আতি কেশ চয়  
 দেখি চমরি দস্ত অস্ত ॥  
 মৃণাল বনিত ভুঞ্জে নারীগণ মন রঞ্জে  
 কর অশোকর কিসলয় ।

৭. মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলে কালকেতুর গৃহে স্বমূর্তিধারিণী চণ্ডীর বর্ণনা দ্রষ্টব্য

সুঠান অঙ্গুলী চয়

চম্পার পাকরি নয়

দেখিতে সুন্দর মনোময় । ইত্যাদি ।

সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকেব শেষভাগে কবি অনন্ত আচার্য 'আনন্দ-লহরী' নামক শঙ্করাচার্য-কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃত তন্ত্রগ্রন্থখানিকে অবলম্বন করিয়া 'আনন্দ-লহরী' নামে অসমীয়ায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা অলুবাদ নয়। মূলে যে ৪১টি শ্লোক রহিয়াছে তাহার সহিত সম্পর্কও অতি ক্ষীণ; মূলের সামান্ত কিছু তথ্য ও তদ্ব অবলম্বনে কবি প্রায় স্বাধীন বচনা। কবির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে ভবানী-ঈশানের বসতিস্থান 'সৌম্য পীঠে'র বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। 'আনন্দ-লহরী'তেও দেবীর বাহুরূপের যে দীর্ঘ বর্ণনা পাই তাহা বিজয়দশমীর দেবীর বর্ণনারই অলুৰূপ।—

অরুণ চরণযুগ নুপুরে রঞ্জিতা ।

দশ নখে চন্দ্র জিনি প্রকাশে তহিত ॥

শূলক দুইক দেখি মোহ হরে মুনিগণ ।

রাম কদলীক নিম্নে উরু দুই জন ॥

...

পূর্ণ চন্দ্র জিনিয়া শোভন্ত তাতে মুখ ।

যাক দেখি ভকতর মিলে মনে সুখ ॥

ডামির বীজ নিম্নে দশনর পাশ্চি ।

ঈশং হস্ততে তাতে করি আছে কাস্তি ॥

রাতুল অধর শোভে পকবিষ সম ।

নাসা তিল পুষ্পতো অধিক নিরুপম ॥

, মৃগীর চক্ষুক নিম্নে নয়ন ত্রিতয় ।

ক্রম যুগ অনঙ্গর ধনুক জিনয় ॥<sup>৮</sup> ইত্যাদি ।

কিন্তু ইহা ত হইল মায়ের স্থূল রূপ, বা প্রকট রূপ; মায়ের সূক্ষ্মরূপে মা কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে মূলাধার-চক্রে প্রতি জীবদেহে অবস্থান করেন। অ-মধ্যস্থ আচ্ছাচক্র হইল শিবধাম—

তাহার কণিকা মাঝে আছে সদাশিব ।

সদানন্দ তব স্বামী জগতর জীব ॥

...

তুমি থাকা মূলাধার বাহিরে সুন্দরী ।

হর আছে তমু পতি অনঙ্গর অরি ॥

তুমি কামাকুল হৈয়া রহিতে না পারি ।

ঘনে ঘনে চেগ চোরা যেন বেশানারী ॥

দুৰ্গম স্থানত আছে মোৰ পতি শিব ।  
 তান সঙ্গে নঠৈল নঠৈব মোৰ জীব ॥  
 এক মুদ্রা শত ভাগ দ্বিতো মূল্যধার ।  
 তার এভাগৰ সম করি কলেবর ॥  
 সেহি রূপে স্বস্থয়ার মধ্যে প্রবেশিয়া ।  
 ছয় পদ্ব সমে ছয় তলুক ভেদিয়া ॥  
 শীঘ্র বেগে গৈয়া তুমি করি মহারঙ্গ ।  
 রহস্ত স্থলত পাইলে নিজ পতি সঙ্গ ॥  
 বিরহ বন্ধিক নিবারিল তান সঙ্গে ।  
 জীড়া করি পতি সমে ভৈল মহারঙ্গে ॥

কিন্তু মূল্যধারস্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তি উদ্ধৰ্গা হইয়া শিবসঙ্গে একবার মিলিত হইয়া সেইখানেই অবস্থান করেন না; ‘মহাবঙ্গ’ আশ্বাদ করিবার পবে তিনি আবার নিয়গা হইয়া নিজাবাসে ফিরিয়া আসেন।—

সেহি পথে আসি পূৰ্ব স্থান পাইল আর ।  
 মূল্যধার বাহিরত ত্রিকোণ আকার ॥  
 আপুনাক ভূজঙ্গর সমান কবিয়া ।  
 লক্ষ্মা শ্রমে মের দিয়া থাকিল শুতিয়া ॥

ইহা তত্ত্ব-সাধনার গভীর রহস্ত। কবির বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, তিনি শুধু পুণ্ড্রিগত বিজ্ঞার উপরে নির্ভর করিয়া এ-সকল বর্ণনা কবেন নাই; তাঁহার নিজের এই সাধন-রহস্তে কিছু কিছু প্রবেশ ছিল। তত্ত্ব-সাধনাকেই তিনি কলিযুগের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া মনে করিয়াছেন। এ-বিষয়ে তিনি তাঁহার গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

মোক্ষর সাধন আছে যত কোনো কোনো ধানে নানা মত  
 হেন দেখি তুষ্ট নষ্টল শস্ত্র মন ।  
 কলিকালে যত লোকচয় বহু শাস্ত্র চাইতে করি ভয়,  
 অনর্থ করিব নাজানি কোনো সাধনা ॥  
 ইহেতু অতত্ত্ব তত্ত্ব নাম যাত ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম,  
 তাকে পৃথিবীক আনিলা তোমার পতি ।  
 সেহি সে তোমার নিজ তত্ত্ব তাতে আছে নানা যন্ততত্ত্ব,  
 তারে সে মন্ত্রক উদ্ধারো তমু সস্ততি ॥

অসমীয়া লোক-সাহিত্যে নানাভাবে দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। লোক-সাহিত্যে দেবী ‘আই’ (সংস্কৃত আধিকা) নামেই প্রসিদ্ধা। বাঙলায় আমরা যেমন বহু স্থলে আদিদেবীর উল্লেখ পাই, অসমীয়া সাহিত্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই ‘আদি-গোসানী’ রূপে। অসমীয়া ‘বারমাহী গীতে’ (বারমাসী গীত) স্থানে স্থানে আশ্বিন মাসে বলিদানসহ

দেবীপূজার উল্লেখ পাই।\* বিবাহ উপলক্ষ্যে যে গান হয় তাহার নাম ‘বিয়া-নাম’। এই বিয়া-নামে হর-গৌরীর বিবাহের গান কিছু কিছু গাওয়া হয়। এইসব গানে হর-গৌরীকে অবলম্বন করিয়াই পল্লীর সমাজ-চিত্র এবং তৎসঙ্গে কিছু কিছু গ্রাম্য স্থল রসিকতাও দেখিতে পাই। একটি গানে দেখি, লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই ভগিনী হরের নিকট হইতে গৌরীর জন্ত অলংকার লইয়া আসিয়াছে, গৌরী ঘরের বাহিরে আসিয়া সাদরে সেই অলংকার পরিতেছে। হরের ঘর হইতে অলংকার আনিয়াছে পিতলের বড় খালায় ভরিয়া—ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া গৌরী মাথা নত করিয়া সব গ্রহণ করিতেছে।

লক্ষ্মী সরস্বতী                      দুই ভনী আহিছে  
হরে অলঙ্কার লৈ।

ওলাই আহা গৌরী                      পিঙ্কহি সাদরী  
মেনকার আগতে কৈ ॥

হররে ঘররে                      অয়ে অলঙ্কারে  
আনিছে শরাই ভরাই।

ভিতররে পরা                      ওলাই আহা গৌরী  
লোবাহি মাথা দোরাই ॥\*০

একটি ‘গাৰ্ভালীয়া গীতে’ (গ্রাম্য গীত) কোন্‌দল-পরায়ণ গ্রাম্য হর-পার্বতীর একটি চমৎকার ছবি ফুটিয়া উঠিয়া উঠিয়াছে। গানটির নাম ‘পগলা পার্বতীর গীত’; পার্বতী এখানে কৈলাসবাসিনী পার্বতী মনে করিবার কোনও কারণ নাই, পার্বতী এখানে স্বামীর সঙ্গে সমানে যুঝিবার একটি গ্রাম্য বধু,—আর ‘পগলা’ বা পাগলা শিবাই এখানে যে-কোনও গোঁয়ার স্বামী। কোন্‌দলের ফলে পার্বতী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, ‘পগলা’ শাসাইতেছে, পাইলেই কিলাইবে। সমস্ত গানে ‘পগলা’ ও ‘পার্বতী’র উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে। ‘পগলা’ বলিতেছে, ‘মায়ের ঘরে তুই যদি যাবি পার্বতী তবে পথে ধাপ দিয়া ধরিব।’

মারর ঘরলৈ                      যাবি তঞি পার্বতী  
বাটত খাপে দিয়ে ধরিম।

পার্বতী বলিতেছে—

বাটত খাপে দিয়ে                      ধর তঞি পগলা  
হাবিত লরে মারি পরিম ॥

৯. আহিনর মাহতে দেবীর অষ্টমী  
হাঁহ কাটে পাঠা কাটে পায় জাকে জাক।  
যতে আছে প্রাণস্বামী তৈতে ভালে থাক ॥

—অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ

১০. বিয়া-নাম, অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ

‘বাটে খাপ দিয়া ধৰিবে যদি পাগলা তবে জঙ্কলে দোঁড়াইয়া চুকিব।’ ‘পগলা’ও ত ছাড়িবার পাত্ৰ নয়, সে বলিল—

হাবিত লৱে মাৰি                      সোমা তঞি পাৰ্বতী

হাবিত জুয়ে দিয়ে ধৰিম।

‘জঙ্কলে দোঁড়াইয়া যদি চুকিয়া পড়িস পাৰ্বতী, তবে জঙ্কলে আশুন দিয়া তোকে ধৰিব।’  
পাৰ্বতীও অত সহজে ধৰা পড়িবার মেয়ে নয়; সে বলিল—

হাবিত জুয়ে দিয়ে                      ধৰ তঞি পগলা

ধোৱায়ে লগতে উড়িম ॥

‘জঙ্কলে আশুন দিয়া যদি ধৰিস তুই পাগলা, আমি তবে ধোৱাৰ সঙ্গে উড়িব।’  
‘পগলা’ বলিল—

ধোৱাৰ লগতে                      উড় তঞি পাৰ্বতী

হাঁকুটি জোৱায়ে ধৰিম।

‘ধোৱাৰ সঙ্গে উড়িস যদি তুই পাৰ্বতী তবে আকশি জোড়া দিয়া দিয়া ধৰিব।’  
পাৰ্বতী উত্তৰ কৰিল—

হাঁকুটি জোৱায়ে                      ধৰ তঞি পগলা

তোৱে বড় বিলত পড়িম ॥

‘আকশি জোড়া দিয়া দিয়া যদি ধৰিস তুই পাগলা, তবে তোৱ বড় বিলে পড়িব।’ ‘পগলা’  
বলিল, ‘বড় বিলে পড়িলে জাল বাইয়া ধৰিব’; পাৰ্বতী বলিল, ‘তবে শামুক হইব’। ‘পগলা’  
বলিল, ‘তবে তোকে পোড়াইয়া চুন কৰিয়া খাইব’। পাৰ্বতী উত্তৰ কৰিল, ‘তবে তোৱ  
তুই গাল পোড়াইব’। ‘পগলা’ বলিল, ‘গাল পোড়াইলে তোকে তেল ঘষিয়া ঘুচাইব।’  
পাৰ্বতী বলিল, ‘তবে আমি সবিষা জন্ম ধৰিব।’ ‘তোকে তবে তেলীৰ ঘানিতে ফেলিব’।  
‘তবে খইল জন্ম ধৰিব’। ‘তোকে তবে বাড়িৰ কোণে ফেলিব’। ‘আমি তবে বাড়িৰ  
কোণে বাড়িৰ বড় গাছ হইব’। তখন ‘পগলা’ বলিল, ‘বাড়িৰ বড় গাছই যদি হবি তুই  
পাৰ্বতী তবে তোকে কাটিয়া নাও কৰিয়া বাহিব।’

বাড়িৰ বড় গছ                      হবি তঞি পাৰ্বতী

তোকে নাও কাটি বাম।

গ্ৰাম্য পাৰ্বতীও কিছু কম যায় না, সে উত্তৰ কৰিল—

মোকে নাও কাটি                      বাবি তঞি পগলা

মাঝতে বুৰায়ে মাৰিম ॥’

‘আমাকে নাও কাটিয়া বাহিবি যদি তুই পাগলা, মাঝে তোকে ডুৰাইয়া মাৰিব’।

এই ‘গাৰলীয়া গীতে’ৰ মध्ये ‘টোকাৱী নাম’ নামে একটি গান দেখিতে পাই, সেখানে  
আবার খানিকটা সম্ভাভাষায় বৰ্ণনা দেখিতে পাই; লৌকিক বৰ্ণনাৰ ফাঁকে ফাঁকেই আবার

কিছু কিছু সাধনার কথা। টোকারী হইল কাঠখণ্ডের সঙ্গে ‘গুণা’ বা তার বাধিয়া একরূপ বাস্তব। কৈলাসের যে গাছটিতে মেলিতেছে দুইটি পাতা—নীচে ছড়াইয়া পড়িতেছে শিকড়, সেই গাছই ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিতেছেন মহাদেব—টোকারীর জন্ত ভাল কাঠ কোথায় পাওয়া যায়। ভাল কাঠ বাছিয়া মহাদেব যখন টোকারী সাজাইলেন তখন পার্বতী পথের মধ্যে আনিয়া দিলেন ‘গুণা’ বা তার ; এ-গুণা চারিটি—ইড়া, পিঙলা, হুয়ুয়া ও হুয়ুয়ার মধ্যবর্তী চিত্রা—এই চারিটি নাড়াই হইল চারিটি ‘গুণা’।

মহাদেউ গোসাঞি                      টোকারী সাজিলে

বাটে পারাবতী গুণা।

ইঙলা পিঙলা

চিত্রা হুয়ুয়া

এই চারিগাছি গুণা ॥

কিন্তু ইহার পরই দেখিতেছি শিব পার্বতীকে ভাঙ দিতে বলিতেছেন, আঁটিয়া কলা খাইতে চাহিতেছেন—এই সব খাইয়া টোকাবী হাতে ভিক্ষায় যাইবেন। আর ভিক্ষায় যাইয়াই বা কি হইবে, বৃদ্ধ ভিক্ষারিকে কুকুরে কামড়ায়—বালকে ঢিল ছোড়ে—ভিক্ষায় মেলে না খুদুও।

ছাত্র ভাঙ্গএ মুঠি                      নমাই আন পার্বতী

আঁটিয়া কলেরে খাওঁ।

কৈলাসর টোকারী                      নমাই আন পার্বতী

ভিক্ষা মাগিবলৈ যাওঁ ॥

কুকুরে উপরি দুখ।

কুকুরে কামোরে                      ছবালে দলিয়াই

ভিখাতো নিমিলে খুদু ॥

অসমীয়া লোক-সংগীতের আর-একরূপ সংগীত হইল ‘আই নাম’ বা ‘আইর নাম’। সাধারণভাবে দেবীই হইলেন ‘আই’, দেবীকে অবলম্বন করিয়া যে সঙ্গীত তাহাই ‘আই নাম’। সাধারণতঃ মেয়েরাই মিলিত ভাবে এই গান করিয়া থাকেন। আসামের এই ‘আই নামে’র মুখ্য লক্ষ্য হইলেন কিন্তু শীতলা দেবী ; তিনিই ভবানী, ঈশানী, পার্বতী, জুর্গা। গানগুলি গীত হয়ও সাধারণতঃ শীতলার সম্মুখে। একদিক হইতে তথ্যটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ‘কালিকা-পুরাণে’ যেভাবে কামরূপের মহিমা কীৰ্ত্তিত হইতে দেখি তাহাতে মনে হয় গ্রন্থখানি ঐ অঞ্চলেই রচিত এবং কালিকাব উদ্ভব না হইলেও প্রসিদ্ধি এই অঞ্চলেই ছিল ; কিন্তু গত পাঁচ শত বৎসরের অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির দাবা এই অল্পমান মোটেই সমর্থিত হয় না। কালী বা কালিকার উল্লেখ একজন সাধারণ দেবীরূপে মন্ত্রে-তন্ত্রে উল্লিখিত হইতে দেখিলেও,<sup>১৭</sup> কালী বা কালিকার প্রসিদ্ধি

১২. তুলনীয়—

বাঙ্কিলা সাগরে নেদিলা উত্তর।                      তেখনে গৈলা কালিকার ঘর ॥

আসামে—এমন কি কামৰূপ অঞ্চলেও কিছুই নাই। কালিকা-পুৰাণের মধ্যে দেবীৰূপে কালিকার যে প্রাধান্ত তাহাই বা ঐ অঞ্চলে এক সময়ে অমন করিয়া গড়িয়া উঠিল কেন এবং পরবর্তী কালে তাহা একেবারে উবিয়াই বা গেল কেন তাহাব যথোপযুক্ত কারণ এখন পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি নাই। কামৰূপ-কামাখ্যার প্ৰসঙ্গে কিছু কিছু কারণের উল্লেখ করিয়াছি বটে, কিন্তু এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। ‘আই নামে’ দেবীর সর্ব প্ৰকারের বৰ্ণনার মধ্যেই শীতলাক্লম্বিনীদেৱীর পরিচয় আছে।

আই ভগবতী আই, তোমাব মান স্ননর নাই।

অধিকা চণ্ডিকা ভবানী কালিকা এই রূপে ফুৰা বেড়াই।

কিন্তু ঠিক ইহার পরের পংক্তিতেই দেখি—

আই ভগবতী আই, বসন্তে বা বলাই।

সেই আই-ই আবার নীলাচলের (নীলগিরি বা কামাখ্যা পাহাড়) কামাখ্যা, কৈলাসের দেবী।

আই ভগবতী আই, তোমার নীলাচলে রতি।

দুখানি চরণত প্ৰাৰ্থনা করিছো রক্ষা করা ভগবতি ॥

আই ভগবতী আই, রাতিকো করিলা দিন।

এক হাতে লৈলা কৈলাসর টোকারী আর হাতে লৈলা বীণ ॥<sup>১০</sup>

ব্ৰহ্মগোপীরা কৃষ্ণলাভের জন্ত কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিয়াছেন; সেই উপাখ্যানের প্ৰভাবেই দেখিতে পাই, আইয়ের ভক্ত গোপীরা—আর আইয়ের সঙ্গে যুক্ত হই-কথা।

আসন পারি দিয়া                      বহক মহামায়া

ধাকক হরিকথা শুনি।

সকল গোপীয়ে                      একান্ত চিত্তে

বোলা দুৰ্গতি নাশিনী ॥<sup>১১</sup>

অন্ত একটি স্নন্দর পদে দেখি—

আসনতে বাহি আয়ে নমাই দিছে ভরি।

গোপিনীয়ে তুতি করে চরণেতে ধরি ॥

আসনরে চউপাশে চম্পা নাগেশ্বর।

মলমলি গোন্ধাই আছে আইরে বহা ঘর ॥

আসনরে চউপারে ফুলিছে টগর।

আসনতে বহি আয়ে ভাঙ্কিছে জগর ॥

কালিকায় আছে দুই শাখা পিঙ্কি। তেবনে কালিকাই পেলাইলেক বাঙ্কি ॥

বাঙ্ক পাই কালিকাই অচিন্ত চাই। কিম্ব বাঙ্কিলা আমাক পাই ॥ ইত্যাদি।

—পক্ষীৰাজ মন্ত্ৰ, অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ

১৩. আইর নাম, ঐ

১৪. আইর নাম, ঐ

আসনরে চউপাশে ফুলিছে কেতেকী ।

দাল ভাদি ফুল পারে হররে পার্বতী ॥<sup>১৫</sup>

আমরা জানি কালী, করালী, মনোজবা প্রভৃতি অগ্নির সপ্তজিহ্বা হইতে সপ্তদেবীর পরিকল্পনা জাগিয়াছে। ইহাবই প্রভাবে এই অসমীয়া লোক-সংগীতগুলিতে বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, ‘আইরে সাত ভনী’—আইরা সাত বোন। গানগুলির মধ্যে বসন্তের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার করুণ আর্তিই অনেক স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভক্ত তাই প্রায় সর্বত্রই ‘হুখীয়া’ বলিয়া বর্ণিত। একটি পদে আছে—

হুখীয়ার পুতলা                      আয়ে তুলি দিলে,

আইর মান ধরমী নাই ।

আই নাম শীতলা                      হুখীয়ার পুতলা

দিখোরা বুকু জুৰাই ॥

আসামে বসন্তের প্রকোপ হইলেই ‘আই’ শীতলাকে কৈলাস হইতে আবাহন করিয়া নামাইয়া আনিতে হইবে; একটি ‘আই’-এর গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া সেখানে এক আসনে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—পরে তাঁহার নিকটে আতি-নিবেদন। কিন্তু এই ‘হুখীয়া’র ‘পুতলা’র জন্তই যে সর্বত্র আর্তি ফুটিয়াছে তাহা নহে, স্থানে স্থানে গভীর ভক্তিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কি দিয়া পূজিম আই চরণ দুখানি ।

তোমাক পূজিবর বস্তু নেদেখো গোসানী ॥

ফুল দি পূজিলো হেঁটেন ভোমোরাই চুমিলে ।

হুঙ দি পূজিলো হয় ডামুরীয়ে পিলে ॥

ধন দি পূজিলো হয় আপোনাতে আছে ।

জল দি পূজিলো হয় বিতালিলে মাছে ॥

অন্ন দি পূজিলো হয় গরুরে খিছিলে ।

বস্ত্র দি পূজিলো হয় মার দি সিজালে ॥

দেহ দি পূজিলো হয় পাপে জর্জরিত ।

মন দি পূজিলো হয় মনর নাই খিত ॥

যেই বস্তু দি দিওঁ মাতৃ সেই বস্তু চুৰা ।

নাম দি পূজিম মাতৃ গোধূলি যে পুরা ১৬

ফুল দিয়া পূজিলে হয়, কিন্তু ফুল ভোমরায় চুমিয়াছে; হুঙ দিয়া পূজিলে হয়, হুঙ বাছুর পান করিয়াছে। ধন দিয়া পূজিলে হয়, ধন ত দেবীর নিজেরই আছে। জল দিয়া পূজিলে হয়,

১৫. আইর নাম, অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ

১৬. আইর নাম, অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ

জল নষ্ট কৰিয়াছে মাছে। অন্ন দিয়া পূজিলে হয়, কিন্তু অন্ন (ধান) ত গোকৰ্ণদ্বাৰা মাড়ান হইয়াছে, বস্ত্ৰ ত মাড় দিয়া অপবিত্ৰ কৰা হইয়াছে; দেহ দিয়া পূজিলে হয়, কিন্তু দেহ ত পাপে জৰ্জৰিত। মন দিয়া পূজিলে হয়, মনের নাই স্থিতি। বাহিৰেৰে যে উপচাৰেৰে কথাই ভাবা যায় সব উপচাৰই অপবিত্ৰ—স্তুতৰাং শুধু মায়েৰ নাম দিয়াই মাকে সন্ধ্যা-সকালে পূজা কৰিতে হইবে।

বাঙলা-আসাম অঞ্চলে একৰূপ ঝাড়-ফুঁকেৰ তুতাক মন্ত্ৰ আছে, ইহাৰ একটা বিশেষ ভাষা আছে। বাঙলাদেশে এই-জাতীয় যে মন্ত্ৰ-ছড়া আছে তাহা বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক ভাষাৰ সহিত মিশ্ৰিত কতকগুলি আপাত-অৰ্থহীন মন্ত্ৰ; কোথাও এগুলি সংস্কৃত তন্ত্ৰোক্ত মন্ত্ৰ, কোথাও কতকগুলি অৰ্থহীন শব্দসমষ্টি। এই মন্ত্ৰগুলিৰ মধ্যে কতকগুলিতে দেখি শিবের-দোহাই—কতকগুলিতে শিব ও দেবী উভয়েৰ দোহাই—কতকগুলিতে শুধু দেবীৰ দোহাই। সাপেৰ বিষ বা অন্ত কিছুৰ বিষ অথবা বিষাক্ত ঘা প্রভৃতি সম্বন্ধে যত তুতাক মন্ত্ৰ সেখানে মনসা অথবা পদ্মবতী বা বিষহরীৰ নিকট প্রাৰ্থনা ও দোহাই-ই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অগ্ৰান্ত ক্ষেত্ৰে যেখানে দেবীৰ দোহাই সেখানে দেবী শিবানী, ভবানী, দুৰ্গা, চণ্ডিকা। এই তুতাকেৰ ব্যাপাৰে কামৰূপ-কামাখ্যাৰ অত্যন্ত প্রসিদ্ধি বলিয়া বাঙলাদেশেৰ এই-জাতীয় অনেক মন্ত্ৰেও কামৰূপ-কামাখ্যাৰ দোহাই দেখিতে পাই। ভূত-ঝাড়োৰ মন্ত্ৰে ত সৰ্বত্ৰই প্রায় কামাখ্যা। তা ছাড়া বাঙলাদেশেৰ মেয়েদেৱ, বিশেষ কৰিয়া কুলবধূগণকে যে-সব ভূতে ধৰে তাহাৰা সাধাৰণতঃ কামাখ্যাৰই কোনও যোগিনী। কামৰূপ এই তুতাকেৰ দেশ বলিয়াই বহুদিনেৰ প্রসিদ্ধি। কামৰূপেৰ একখানি নিজস্ব তন্ত্ৰ আছে, কাম-বস্ত্ৰ-তন্ত্ৰ,<sup>১৭</sup> ইহা মুখ্যতঃ তুতাকেৰই তন্ত্ৰ। অসমীয়া ভাষায় বচিত এইৰূপ বিবিধ ব্ৰকমেৰ তুতাক ঝাড়-ফুঁকেৰ মন্ত্ৰ জনসাধাৰণেৰ মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীৰ প্রভাবই ইহাৰ ভিতৰে সৰ্বাধিক। গৃহকম্পন মন্ত্ৰে দেখি—

রক্ত পিতল আর তাম্র কাস।

খল খল দেবী তুলিয়া হাস।

যেবে স্ননিবি মায়েৰ দোহাই।

হরণ বস্তুক পেলাই দিবি তাই ॥<sup>১৮</sup>

‘তাম্বল ঝাৰা’ মন্ত্ৰে—

ফল ধরি ডাক পারে পোসিনী।

ভুতুনী প্রেতনী পিসাচিনী বিড়ালি কিল কিল ধনি,

আই বিড়াক বন্দি কৰোঁ দেবীৰ আজ্ঞাক মানি। ইত্যাদি।

‘কদলী-পত্ৰ ঝাৰা’ মন্ত্ৰে দেখি, ‘দুৰ্গাৰ তলপে ঝাৰিলোঁ পত্ৰ।’ ‘চিকনি ঝাৰা’ মন্ত্ৰেও

১৭. হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী-সম্পাদিত, অসমীয়া সাহিত্যেৰ চানেকি, ভূমিকা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৪-৫৫

১৮. অসমীয়া সাহিত্যেৰ চানেকি, প্রথম খণ্ড

হুর্গার তলপ এবং ভবানীর সপত । ‘সুত্র ঝারা’র দেখি ‘মহামাই।দেবী’ নিজেই বাধিবার  
সুত্র কাটিয়া দেন এবং শেষে দেখি—

দেবীর চরণ চিস্তি বোহো একমনে ।

এহি গাঠির উপরে যি করিব যায়ে ।

খাণ্ডা ধরি কাটিব তাক কালিকা চণ্ডী মায় ।

‘সরিসা ঝারা’ মস্ত্রে ‘দেবীকার বর’ । ‘দিশ ধন্দি’ মস্ত্রে দেখি, ‘ও নাভিকুণ্ডলী দেবী  
ভবানীর সপত । মোর বচন হুহি হুর্গাদেবীর ডাক ।’ ‘ধলুবাটলি’ মস্ত্রে ‘মাটি দেবী  
আনিলা কাটি’ এবং ‘বাটলি হৈ’ গেল দেবীর পাকত’ । ‘গড় মস্ত্রে’ দেখি, ‘মহাদেবী  
হুর্গাদেবী পাতি আছে খেড়ি ।’ ‘বিড়া বন্ধ’ মস্ত্রে ‘মহাদেবের আজ্ঞায় হুর্গার বর’ ।

# হিন্দী ভাষার কথা

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

হাজার বছরের হিন্দী-সাহিত্য একাধিক ভাষাকে আশ্রয় কারয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ষাদশ শতকের চারণ-কবি চন্দ্র বরদাস হইতে শুরু করিয়া মধ্যযুগের কবীর-স্বর-তুলসী-কেশব-বিহারী এবং আধুনিক যুগের ভাবতেন্দু-পঙ্ক-নিরলা-প্রসাদ ও মৈথিলীশরণ গুপ্ত পর্যন্ত যে সাহিত্যধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়—ব্রজভাষা, অরধী ও খড়ীবোলী।

ইহা ছাড়া উত্তর-ভারতের মধ্যদেশের ভাষা বলিয়া প্রাচীন হিন্দীর উপর সন্নিহিত আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবও এক-আধটু পড়িয়াছে। হিন্দী-সাহিত্যের প্রাচীন যুগে ব্রজভাষা ও খড়ীবোলীর সহিত রাজস্থানী ও পঞ্জাবীর কিছু কিছু মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে রাজস্থানী মিশ্র ব্রজভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ নামে চিহ্নিত হইয়া আছে। সাধারণতঃ ইহা ‘পিঙ্গল’ নামে পরিচিত।(১) হিন্দী সাহিত্যের আদিযুগে পিঙ্গলের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এই সম্পর্কে দু-চারিটি কথা বলা আবশ্যক।

প্রাচীন রাজস্থানে সাহিত্যরচনার দুইটি ভাষা প্রচলিত ছিল—একটি ডিঙ্গল, অপরটি পিঙ্গল। মারবাড়ী-মেবাড়ী, মেবাতী-অহীরবাটী, মালবী-জয়পুরী, টুঁটাড়ী-বাগড়ী প্রভৃতি রাজস্থানী উপভাষাগুলির মধ্যে মারবাড়ী বা পশ্চিমা রাজস্থানীর সাহিত্যিক রূপকেই বলা হয় ডিঙ্গল।(২) দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানে ডিঙ্গল এবং উত্তর-পূর্ব রাজস্থানে পিঙ্গল ভাষায় সাহিত্যচর্চা হইত। ডিঙ্গলে রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে “চোলা-মাক্ক রা দোহা” এবং “বেলি ক্রিসন কুম্বীণী রী” বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থ এই, হিন্দী-সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা। কোনো কোনো স্থানে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে যে, হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য বলিতে অপভ্রংশ, ব্রজভাষা, অরধী, পিঙ্গল, মৈথিলী প্রভৃতির সহিত ডিঙ্গল বা রাজস্থানী সাহিত্যকেও বুঝায়।(৩) কিন্তু হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে ডিঙ্গল কাব্যের আলোচনা এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ওড়িয়া কাব্যের আলোচনা একই কথা।

অনেকে আবার পিঙ্গল ভাষায় রাজস্থানীর কিছু বৈশিষ্ট্য দেখিয়া পিঙ্গলকেও ডিঙ্গল

১. হিন্দী সাহিত্যকোশ, ১৯৫৮

২. রাজস্থানী ভাষা ও সাহিত্য (১৯৫১), মোতীলাল মেনারিয়া। পৃ ২০

হিন্দীভাষাকা বিকাশ (১৯৫০), শ্রীমহেন্দ্র দাস। পৃ ৫১

৩. হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫৪, রামকুমার বর্ম। পৃ ৩৩

বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই দুই ভাষার পার্থক্য এই যে, ডিক্সল বিশুদ্ধ রাজস্থানী ভাষা এবং পিজল একটি মিশ্রভাষা। (৪) ইহাতে ব্রজভাষা ও রাজস্থানী দুয়েরই বিশেষত্ব আছে। পিজলে এই দুই ভাষার আপেক্ষিক পরিমাণ সম্পর্কে বিশেষ কোনো নিয়ম ছিল না। লেখকের অভিরুচি অনুযায়ী ইহার তারতম্য ঘটিত।

হিন্দী সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য বলিয়া পরিচিত “পৃথ্বীরাজ রাসো”র (দ্বাদশ শতাব্দী) ভাষা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না আশা করি। “পৃথ্বীরাজ রাসো” বর্তমানে যে আকারে পাওয়া যায়, তাহাতে তাহার ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম-সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া প্রায় অসম্ভব কার্য। (৫) এই গ্রন্থের ভাষা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে অপভ্রংশ, রাজস্থানী, গুজরাতী, পঞ্জাবী ও ব্রজভাষা—এই কয়টির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কেবল “পৃথ্বীরাজ রাসো”তেই নয়, এই যুগের অন্যান্য অসংখ্য রচনাতেও (৬) ভাষাগত মিশ্রণ ও পরিবর্তন ঘটিয়াছে প্রচুর পরিমাণে। শত শত বছর ধরিয়া চারপাশ কবির রচনা লোকের মুখে মুখে ফিরিলে ভাষার আদি রূপ কিছুতেই রক্ষিত হয় না। “পৃথ্বীরাজ রাসো”তেও হয় নাই। কিন্তু রাজস্থানের জনশ্রুতি অনুযায়ী এই গ্রন্থ পিজল ভাষায় রচিত। ইহাতে রাজস্থানী ঘণী বিভক্তির চিহ্ন ‘রা’ কোথাও পাওয়া যায় না। যুদ্ধপ্রধান কাব্য বলিয়া রাসোর ভাষায় কিছু কিছু ডিক্সল রূপের আভাস পাওয়া গেলেও ইহার ভাষা রাজস্থানী হইতে পৃথক। (৭) লক্ষ্য করিবার বিষয়, রাজস্থানী পণ্ডিত শ্রীমোতীলাল মেনারিয়ার “রাজস্থানী ভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থে পৃথ্বীরাজ রাসো এবং অসংখ্য রচনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নাই। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ হিন্দী সাহিত্যেরই অন্তর্গত।

৪. ডিক্সল ও পিজল সম্পর্কে কয়েকটি অভিযত দেওয়া হইল।

- (ক) রাজপুতানার ভাট ও চারণগণ সাহিত্যিক অপভ্রংশকে উত্তরকালে পিজল নামে অভিহিত করিতেন।—ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্যা (১৩৫১/১৯৪৪), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃ ৪৬
- (খ) কাব্যের ভাষা হওয়ার জন্য রাজস্থানে ব্রজভাষার নাম হইল পিজল।—ব্রজভাষা ব্যাকরণ (১৯৩৭) ধীরেন্দ্র বর্ম। পৃ ১০
- (গ) রাজস্থানে নাগর অপভ্রংশ প্রভাবিত হিন্দীর সাহিত্যিক ভাষার নাম ডিক্সল এবং মধ্যদেশের ভাষার নাম পিজল অর্থাৎ ব্রজভাষা।—হিন্দী সাহিত্যিকা আলোচনাত্মক ইতিহাস (১৯৫৪), রামকুমার বর্ম। পৃ ১৩৯। বর্মার গ্রন্থে ডিক্সল সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

৫. চন্দ বরদায়ী ওর উনকা কাব্য (১৯৫২), বিপিনবিহারী ত্রিবেদী। পৃ ২৮৭

৬. খুমান রাসো, হমীর রাসো, বীমলদেব রাসো ইত্যাদি।

৭. সংক্ষিপ্ত পৃথ্বীরাজ রাসো (১৯৫২), হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও নামদর সিংহ সম্পাদিত।

P 30709

ভারতের অজ্ঞাত প্রাদেশিক সাহিত্যের দ্বায় একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের বিশেষ একটি ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকার ফলে প্রাচীন ও মধ্য যুগের হিন্দী সাহিত্যে ভাষাগত বৈচিত্র্য ও জটিলতা সর্বাপেক্ষা অধিক। এই ভাষাগত অনৈক্য কেবল কালের ব্যবধানের জন্তই নহে, স্থানের ব্যবধানের জন্তও বটে। চন্দ বরদাই এবং অমীর খুরো-র মধ্যে কালগত ব্যবধান ৭০ বৎসরের বেশি নয়, কিন্তু ভাষার পার্থক্য অনেক বেশি। সুরদাস এবং মলিক মুহম্মদ জায়সী ছিলেন সমসাময়িক কবি, কিন্তু তাঁহাদের ভাষা স্বতন্ত্র। সুরদাসের রচনা ব্রজভাষায়, আর জায়সী লিখিয়াছেন অবধী-তে। বস্তুতঃ হিন্দী সাহিত্যের কবিগণের আঞ্চলিক ব্যবধান খুবই বেশি। তাঁহাদের কেহ কনৌজের (জগনিক); কেহ বা দিল্লীর (অমীর খুরো); কেহ রাজস্থানের (নরপতি নাল্হ); কেহ বা কাশীর (কবীর দাস); কেহ লাহোরের (গুরু নানক); কেহ বা অযোধ্যার (তুলসীদাস); কেহ বৃন্দাবনের (সুরদাস); কেহ বা মিথিলার (বিজ্ঞাপতি)।

অবশ্য সাহিত্য রচনার জন্ত একটি নির্দিষ্ট ভাষার প্রচলন থাকিলে স্থানগত ব্যবধানে কিছু আসে যায় না। যেমন আধুনিক যুগের সমস্ত হিন্দী লেখক সর্বত্রই একটিমাত্র শিষ্ট ভাষাকে অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া আশালা দিল্লী আগরা কানপুর এলাহাবাদ বারাণসী পার্টনা কলিকাতার হিন্দী রচনায় ভাষাগত বৈষম্য কিছু নাই। রচনা-শৈলীর পার্থক্য অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহা ভাষার অনৈক্য নহে।

প্রাচীন যুগের হিন্দীসাহিত্যে ব্রজভাষা কতকটা শিষ্টভাষারূপে গৃহীত হইলেও উহা কখনই আধুনিক খড়ীবোলীর দ্বায় ব্যাপক রূপ লাভ করে নাই। সেই কারণে প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যে ভাষাগত অনৈক্য বেশি। খুরো খড়ীবোলীতে লিখিয়াছেন তো চন্দ বরদাই লিখিয়াছেন পিজলে; সুরদাস ব্রজভাষার কবি তো তুলসীদাস অবধীর। আধুনিক কালে এই জটিলতা নাই। বর্তমানে কুমাউনের পঙ্ক-ইলাচন্দ জোশী হইতে মিথিলার রামধারী সিংহ দিনকর পর্যন্ত সকলেই এক খড়ীবোলীতে সাহিত্য রচনা করেন।

প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পিজল, ব্রজভাষা, অবধী ও খড়ীবোলীতে রচিত সাহিত্য হিন্দীসাহিত্য নামে পরিচিত। উত্তর-ভারতের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের অধিকারভূক্ত বলিয়া মনে করা হয়, সেই সমস্ত ভূমিখণ্ডের বিভিন্ন উপভাষাও হিন্দী ভাষার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ভাষাশাস্ত্র অনুযায়ী হিন্দী বিশেষ কোনো ভাষাকে না বুঝাইয়া ভাষা-সমষ্টির নামরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে। (৮)

গ্রিয়ারসন সাহেব তাঁহার *Linguistic Survey of India* গ্রন্থে (২) হিন্দীকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—পূর্বী হিন্দী ও পশ্চিমা হিন্দী। (১০) আজ পর্যন্ত ভাষা-

৮. হিন্দী ভাষাকা ইতিহাস (২য় সং, ১৯৪০), ধীরেন্দ্র বর্মা, পৃ ৫৭-৫৮

৯. Vol. I, Pt. 1, P. 158.

১০. আলোচ্য ক্ষেত্রে পূর্বী হিন্দী ও পশ্চিমা হিন্দীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনার স্বযোগ নাই। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। পশ্চিমা হিন্দীতে ঘোড়া, সখী



7588

শাস্ত্রের আলোচনায় মোটামুটি এই বিভাগই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। পশ্চিমা হিন্দী বলিতে খড়ীবোলী(১১), বাংগুরু, ব্রজভাষা, কনৌজী এবং বৃন্দেলী—এই পাঁচটি ভাষাকে বুঝাইয়া থাকে। অরধী, বঘেলী ও ছত্তীসগড়ী—ইহারা হইল পূর্বা হিন্দী। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পশ্চিমা হিন্দীর উপভাষাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে শোরসেনী অপভ্রংশ হইতে এবং অধমাগধী অপভ্রংশ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে পূর্বা হিন্দীর উপভাষাসমূহ। উত্তরে হিমালয়ের তরাই হইতে দক্ষিণে বৃন্দেলখণ্ড পর্যন্ত এবং পশ্চিমে পঞ্জাবের সরহিন্দ হইতে পূর্বে কানপুর পর্যন্ত পশ্চিমা হিন্দীর ক্ষেত্র।(১২) পশ্চিমে লখনউ-কানপুর হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে জৌনপুর-মির্জাপুর পর্যন্ত পূর্বা হিন্দীর ক্ষেত্র প্রসারিত। পূর্বে-পশ্চিমে ইহার বিস্তার মাত্র আড়াই শ' মাইল। কিন্তু উত্তরে নেপাল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের বস্তার পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ৭৫০ মাইল।(১৩)

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপরে হিন্দীর যে আটটি উপভাষার কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভোজপুরীর উল্লেখ নাই। গ্রিয়ারসন সাহেব ভোজপুরীকে হিন্দীর পরিবর্তে বিহারী ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।(১৪) বাংলা, ওড়িয়া ও অসমীয়ার ভাষা বিহারী

ইত্যাদি শব্দ বহু বচনে ঘোড়ে, সখিয়াঁ ইত্যাদি রূপ প্রাপ্ত হয়। পূর্বা হিন্দীতে এইরূপ কোন পরিবর্তন ঘটে না। এ সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। পূর্বা হিন্দী অঞ্চলের এক কবি গিয়াছেন দিল্লী। তাঁহার একটু অহঙ্কারই ছিল যে, পশ্চিমা হিন্দীতে তিনি ‘জবান দাঁ’ (ভাষাবিৎ) হইয়া উঠিয়াছেন। বাজারে গিয়া এক শাকওয়ালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মুলো কী দরে দেবে—মুলী কৈসে দোগী ?

শাকওয়ালী বলিল—একটা মুলোর দাম আর কী বলব—এক মুলী কা ক্যা দাম বতাই ?

কবি বললেন—একটা নয়, আরও নেব—এক হী নহী, ঔব লুকা।

তখন শাকওয়ালী বলিল—তাহলে বলুন ‘মুলোগুলি’—তো কির মুলিয়াঁ কহিয়ে।—  
রামচন্দ্র শঙ্কর লিখিত “বুদ্ধ চরিত” গ্রন্থের কাব্যভাষা (পৃঃ ২০) হইতে গৃহীত।

১১. গ্রিয়ারসন সাহেব তাঁহার গ্রন্থে খড়ীবোলীর পরিবর্তে Hindostani কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দী ভাষাশাস্ত্রের আলোচনায় ও হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থাদিতে হিন্দুস্তানীর পরিবর্তে খড়ীবোলী কথাটিরই বেশি ব্যবহার দেখা যায়।

১২. হিন্দী ভাষাকা বিকাশ (১৯৫০), শ্রীমন্তনন্দ দাস। পৃ ১৯

Western Hindi covers the country between Sarhind in the Panjab and Allahabad in the united provinces. This almost exactly corresponds to the Madhyadesa or midland as the true home of the Indo Aryan people. L. S. I. Vol. 1, Pt. 1, p. 162.

১৩. Linguistic Survey of India, Vol. 1, Pt. 1, p. 158.

১৪. ঐ p. 149.



ভাষাসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে মাগধী অপভ্রংশ হইতে। সুতরাং উৎপত্তির দিক হইতে বিচার করিলে মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরী - বিহারের এই তিনটি ভাষাকে একই শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মৈথিলী ও মগহী যেমন পরস্পরের নিকটসম্পর্কস্থজে আবদ্ধ, ভোজপুরী সেক্ষেপ নহে। কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী ভোজপুরীকে মৈথিলী-মগহী হইতে অনেকাংশে পৃথক বলিয়া মনে করেন। (১৫) বিহারের নিজস্ব ভাষা মৈথিলী-মগহী হইতে বেশ কিছু স্বতন্ত্র বলিয়া এবং পূর্বী হিন্দীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলিয়া ভোজপুরী ভাষাকেও হিন্দীর অন্ততম উপভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। (১৬)

এইরূপে হিন্দীর উপভাষার সংখ্যা দাঁড়াইল নয়টি—শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত খড়ীবোলী, বাংগর, ব্রজভাষা, কনৌজী ও বৃন্দেলী; অধঃমাগধী হইতে উদ্ভূত অরধী, বঘৌলী ও ছত্তীসগড়ী; পশ্চিমা মাগধী হইতে উদ্ভূত ভোজপুরী।

সংক্ষেপে উল্লিখিত উপভাষাসমূহের আলোচনা করা যাইতেছে।

১। খড়ীবোলী—হিন্দীর যে উপভাষাটি বর্তমানে শিষ্টভাষারূপে সর্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে, তাহারই নাম খড়ীবোলী। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগে হিন্দী বলিতে সাধারণতঃ এই খড়ীবোলীকেই বুঝায়। এই ভাষাকেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। অথচ মূলে ইহা একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের কথ্যভাষা মাত্র। প্রাচীনকালে যাহাকে কুরুজ্ঞানপদ বলা হইত, খড়ীবোলী সেই দিল্লী-মেরঠ (মীরাত) অঞ্চলের নিজস্ব ভাষা। (১৭) হিন্দী-সম্প্রদায়ের সর্বত্র শিক্ষা-দীক্ষা, পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যের ভাষারূপে গৃহীত হইলেও এবং শহর অঞ্চলে শিক্ষিত শ্রেণীর কথোপকথনের ভাষারূপে স্বীকৃত হইলেও খড়ীবোলী পল্লীগ্ৰামের জনসাধারণের ভাষারূপে ব্যবহৃত হয় মাত্র চারিটি জিলায়—মেরঠ (মীরাত), মুজফ্ফরনগর, সাহাবানপুর ও দেৱাদুন। (১৮) এই অঞ্চলের উত্তরে পাহাড়ী ভাষা, দক্ষিণে স্প্রেন্সিদ্ধ ব্রজভূমি, পূর্বে কহেলখণ্ড হইতে কনৌজীর সূচনা এবং পশ্চিমে আন্ধালা পৌঁছিলেই পঞ্জাবীর ক্ষেত্র। (১৯)

২। বাংগর—খড়ীবোলীর সংলগ্ন পঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের সাধারণ নাম হরিয়ানা বা বাংগর। (২০) এই কারণে এই অঞ্চলের কথ্যভাষা সাধারণতঃ বাংগর বা হরিয়ানী নামে পরিচিত। পাণীপথ, কুরুক্ষেত্র, কার্ণাল, রোহতক, হিসার প্রভৃতি অঞ্চল বাংগর

১৫. *A History of Maithili Literature*, Vol. I, Jaykanta Misra, P. 95.

১৬. হিন্দী ভাষা ওর লিপি ( ১৯৪৯ ), ধীরেন্দ্র বর্মা। পৃ ৪৭

১৭. খড়ীবোলীকা আন্দোলন ( ১৯৫৬ ), সিতিকর্ষ মিশ্র। পৃ ২

১৮. আত্ম কী সমস্যা ( ১৯৪৫ ), রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন। পৃ ৩৯

১৯. হিন্দী ভাষাকে বিকাশ ( ১৯৫০ ), শ্রীমহেন্দ্র দাস। পৃ ১৯-২০

২০. হরিয়ানা=হরি অর্থাৎ কৃষ্ণের স্থান বা অয়ন অর্থাৎ গমনাগমনের পথ। বাংগর কথ্যটির তাৎপর্ষ উচ্চ শুষ্কভূমি, High dry tract.

উপভাষার অন্তর্গত। এই অঞ্চলে জাটরা সংখ্যায় অধিক বলিয়া এই ভাষা জাটু নামেও পরিচিত।

৩। **ব্রজভাষা**—অনাদুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রধান ভাষা হইল ব্রজভাষা। ধার্মিক দৃষ্টিতে ব্রজমণ্ডল বলিতে মথুরা জিলাকে বুঝাইলেও এই ব্রজমণ্ডলের ভাষা মথুরার চারিদিকে দূরবর্তী অঞ্চলে প্রসারিত। আধুনিক যুগে বিস্তৃত ব্রজভাষাব কেন্দ্র হইতেছে মথুরা, আগরা, আলীগড়, ভরতপুর ও ধৌলপুর। (২১) ব্রজভাষার উত্তরে খড়ীবোলী, পূর্বে কনৌজী, দক্ষিণে বৃন্দেলী এবং পশ্চিমে রাজস্থানের মেবাতী-জয়পুরী ভাষা প্রচলিত।

৪। **কনৌজী**—প্রাচীন কনৌজ বা পঞ্চাল রাজ্যের ভাষা বলিয়া ইহাকে বলা হয় কনৌজী বা পঞ্চালী। কনৌজীর পূর্বে অবধী ও পশ্চিমে ব্রজভাষা প্রচলিত। উত্তরে শাহজানপুর এবং দক্ষিণে কানপুর পর্যন্ত কনৌজী ভাষার কেন্দ্র। ইহার মুখ্য কেন্দ্র বেবেলী ও ফরাক্কাবাদ (ফরুখাবাদ)।

৫। **বৃন্দেলী**—বৃন্দেলখণ্ডে প্রচলিত ভাষার নাম বৃন্দেলখণ্ডী বা সংক্ষেপে বৃন্দেলী। ঝাঁসী, হমীরপুর, গোয়ালিয়র, ভূপাল, সাগর, নুসিংপুর প্রভৃতি অঞ্চল বৃন্দেলখণ্ড নামে পরিচিত। হিন্দী-সাহিত্যের মধ্য যুগে বৃন্দেলখণ্ডে প্রচুর সাহিত্য রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রায় সমস্তই ব্রজভাষায় রচিত। অবশ্য তাঁহাদের রচনায় বৃন্দেলীর যথেষ্ট প্রভাব আছে। মহোবা-কালিঙ্গর বৃন্দেলখণ্ডে অবস্থিত। স্তবরাং মনে হয়, প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্য আলহাঙ্গীত মহোবার কবি জগনিকের কণ্ঠে প্রথমে বৃন্দেলীতেই রচিত হয়। (২২)

৬। **অবধী**—পূর্বা হিন্দীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাষা হইল অবধী। ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের একটি প্রধান অংশের নাম অযোধ্যা বা অবধ। গোস্বামী তুলসীদাসের রামচরিতমানসে অযোধ্যা বুঝাইতে অবধ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়—‘বন্দো অবধপুরী অতি পাবন’। অবধীর পূর্বে ভোজপুরী, পশ্চিমে কনৌজী ও বৃন্দেলী এবং দক্ষিণে বঘেলী প্রচলিত। লখনউ, বায় বেবেলী, সীতাপুর, ফৈজাবাদ, প্রতাবগড় প্রভৃতি স্থান অবধী ভাষার অন্তর্গত। (২৩)

৭। **বঘেলী**—মধ্যপ্রদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (জবলপুর, মাওলা প্রভৃতি জিলা) বঘেলখণ্ড নামে পরিচিত। ইহার ভাষা বঘেলী। বঘেলীর মুখ্য কেন্দ্র রীরা। বৃন্দেলখণ্ডের প্রাচীন কবিরা যেমন ব্রজভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তেমনি বঘেলখণ্ডে সাহিত্য রচিত হইয়াছে অবধী ভাষায়।

৮। **ছত্তীসগড়ী**—মধ্যপ্রদেশের রায়পুর-বিলাসপুর অঞ্চল সাধারণতঃ ছত্তীসগড় নামে পরিচিত বলিয়া এখানকার ভাষার নাম হইয়াছে ছত্তীসগড়ী। অবধীর দক্ষিণে বঘেলী

২১. ব্রজভাষা ব্যাকরণ (১৯৩৭), ধীরেন্দ্র বর্মা। পৃ ১৩

২২. হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস—রামকুমার বর্মা। পৃ ৩৬

২৩. *Evolution of wadhi* (1938), Baburam Saksena.

এবং বঘেলীর দক্ষিণে ছত্তীসগড়ী প্রচলিত। ছত্তীসগড়ী হিন্দীর উপর একদিকে মারাঠী ও অত্রদিকে ওড়িয়া ভাষার কিছুটা প্রভাব পড়িয়াছে।

২। **ভোজপুরী**—বিহারের শাহাবাদ জেলার একটি ছোট পরগণা ভোজপুর হইতে ভোজপুরী নামের উদ্ভব।(২৪) অধিবাসী ও ভাষা দুই অর্থেই ভোজপুরী বা ভোজপুরিয়া প্রচলিত। ভোজপুরী ভাষাব ক্ষেত্র খুবই বিস্তৃত। ইহা পশ্চিম বিহারের শাহাবাদ, চম্পারন, সারন প্রভৃতি জেলা হইতে উত্তর প্রদেশের বলিয়া-গাজীপুর-গোবখপুর-বারণসী-মির্জাপুর-জৌনপুর পর্যন্ত প্রসারিত। কাশী যদিও বহুকাল ধাবৎ হিন্দী সাহিত্যের একটি মুখ্য কেন্দ্র, তথাপি এই অঞ্চলের ভাষা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে খুবই কম। এই অঞ্চলের প্রাচীন কবিরা লিখিতেন ব্রজভাষা ও অরধীতে এবং আধুনিক কবিরা বচনা করেন খড়ীবোলী-হিন্দীতে। কাশীর সাধক কবি কবীন্দ্রদাসের রচনায় অন্তান্ত ভাষার সঙ্গে ভোজপুরীর কিছু মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

উপরে যে নয়টি উপভাষার কথা বলা হইল, উহাব মধ্যে চারটি উপভাষা মুখ্য বলিয়া গণ্য হয়—খড়ীবোলী, ব্রজভাষা, অরধী ও ভোজপুরী। বাকী পাঁচটির মধ্যে বাংগুরু খড়ীবোলীরই প্রকারভেদ মাত্র। ইহাকে কোনো স্বতন্ত্র উপভাষারূপে গণ্য না করিয়া খড়ীবোলীরই একটি উপরূপ বলিয়া মনে করা উচিত। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে পঞ্জাবী ও রাজস্থানীর মিশ্রণ পাওয়া যায়।(২৫) কনৌজী ও বুন্দেলী ব্রজভাষার সহিত নিকট সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ।(২৬) বস্তুতঃ ইহারা একই ভাষার তিনটি শাখা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বুন্দেলীকে যেমন বলা যায় দক্ষিণী ব্রজভাষা, তেমনি কনৌজীকে বলা যাইতে পারে পূর্বী ব্রজভাষা।(২৭) ব্রজ ও বুন্দেলীর যেকোন সম্পর্ক, অরধী ও বঘেলী সেইরূপ কাছাকাছি দুইটি ভাষা। ইহাদের পার্থক্য খুবই সামান্য। বঘেলীকে অরধীর দক্ষিণী রূপ বলা যাইতে পারে।(২৮) মারাঠী ও ওড়িয়ার সন্নিহিত বলিয়া ছত্তীসগড়ী কিছুটা বিকৃত হইলেও উহাকে অরধীরই একটি বিশিষ্ট রূপ বলিয়া গণ্য করা হয়।(২৯) বাংগুরু, কনৌজী,

২৪. ভোজপুরী ভাষা ঐর সাহিত্য ( ১৯৫৪ ), উদয়নারায়ণ তিবারী। পৃ. ৪

২৫. হিন্দী ভাষা ঐর লিপি, ধীবেজ বর্মা। পৃ ৪৭-৪৮

২৬. These three dialects Brajabhasha, Kanauji and Bundeli are all closely conected with each other. L. S. I., Vol. I., pt. I, p. 163.

২৭. ব্রজভাষা ( ১৯৪৫ ), ধীবেজ বর্মা। পৃ ৪

২৮. Bagheli differs so little from Awadhi that, were it not popularly recognized as a separate speech, I should be inclined to class it as a form of that dialect. L. S. I., Vol. I, Pt. I, p. 158.

২৯ The three dialects of Eastern Hindi closely resemble each other. L. S. I., Vol. VI, p. I.

বুন্দেলী বঘেলী, ও ছত্তীসগড়ী—এই পাঁচটি উপভাষার যেমন কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তেমনি সাহিত্য-রচনার দিক হইতেও এইগুলি একপ্রকার নগণ্য।

উপভাষা হিসাবে ভোজপুরী প্রবল ও স্বতন্ত্র হইলেও ইহাতে সাহিত্যিক রচনা বিশেষ কিছু নাই। ভোজপুরী একটি সাময়িক জাতির ভাষা। ভারতীয় সৈন্যবিভাগ এক সময়ে ইহাদের দ্বারাই পুষ্ট হইত এবং সিপাহীবিরোধে ইহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ইহারা বলবিক্রম ও যুদ্ধবিগ্রহেব যেরূপ অচুরাগী, পাণ্ডিত্য ও শিল্পকলার সেক্ষেপ নহে। ভোজপুরীতে উন্নত সাহিত্য রচিত না হওয়ার আর একটি কারণ বোধ করি এই যে, ভোজপুরীবা জায়সী ও তুলসীদাসের অরধীকে নিজেদের সাহিত্যিক ভাষারূপে গ্রহণ করিয়া ভোজপুরীতে স্বতন্ত্র সাহিত্য রচনার আবশ্যকতা বোধ করে নাই। (৩০)

হিন্দীর নয়টি উপভাষার মধ্যে সাহিত্যিক দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্যমাত্র তিনটি—খড়ীবোলী ব্রজভাষা ও অবধী। ইহার সঙ্গে যুক্ত করা যায় প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের প্রধান ভাষা পিঙ্গল।

আপাতদৃষ্টিতে ইহা বিস্ময়কর মনে হইতে পারে যে, হিন্দী সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে অবধী, খড়ীবোলী এবং বিশুদ্ধ ব্রজভাষার পরিবর্তে পিঙ্গল অর্থাৎ রাজস্থানীমিশ্র ব্রজভাষা প্রাধান্য লাভ করিল কেন। হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভবকালে পশ্চিম-ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে। দশম শতাব্দীর শেষভাগে গজনির অধিপতি সুলতান মামুদের রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল পারস্ত হইতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত। একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভাবতবর্ষে মামুদের সূর্য্যন আরম্ভ হয়। এই সময়ে উত্তর-ভারতে রাজপুত রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠাই সর্বাপেক্ষা বেশি। উল্লেখযোগ্য রাজপুত বংশের মধ্যে দিল্লী-আজমীরে চৌহান বংশ, কনৌজে রাঠোর বংশ এবং মহাবা-কালিঙ্গের চন্দেল বংশ। মোট কথা হিন্দীভাষা ও হিন্দীসাহিত্যের পত্তনকালে উত্তর ভারতের ইতিহাসে রাজস্থান ও রাজপুতগণেরই প্রাধান্য। প্রারম্ভিক যুগের সাহিত্যের যতটুকু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ রচিত হইয়াছে রাজপুতানায়। এদিকে তখন শৌরসেনী অপভ্রংশের খোলস হইতে ব্রজভাষাপ্রমুখ পশ্চিমা হিন্দীর জন্ম হইতেছে মাত্র। আবার রাজস্থানের ভাষাগুলিও একপ্রকার মধ্যদেশের প্রাচীন ভাষার বিকসিত রূপ। (৩১) স্ততরাং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, সেই যুগের চারণ-কবিদের রচনায় সাহিত্যিক অপভ্রংশ, ব্রজভাষা ও রাজস্থানীর মিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই মিশ্র ভাষার নামই পিঙ্গল এবং ইহাতেই রচিত হইয়াছে হিন্দী সাহিত্যের আদি যুগের কাব্য খুমান বাসো, বীসলদেব বাসো, পৃথ্বীরাজ বাসো প্রভৃতি।

৩০. বিহারী ভাষাগুলী উৎপত্তি ওর বিকাশ ( ১৯৪২ ), নলিনীমোহন সাক্তাল। পৃ ৩৬

৩১. হিন্দী ভাষা ওর লিপি, ধীরেন্দ্র বর্মা। - পৃ ৩৪

হিন্দীসাহিত্যের আদিযুগে (দশম হইতে চতুর্দশ শতক) অরবী ভাষায় রচিত কোনো কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দীতে এই ভাষায় অনেকগুলি আখ্যান-কাব্য রচিত হয়। রচয়িতাদের সকলেই ছিলেন সুফী মুসলমান। ইহাদের মধ্যে মলিক মুহম্মদ জায়সী-রচিত ‘পদ্মাবত’ হিন্দী সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন। গোস্বামী তুলসীদাস তাঁহার অমর গ্রন্থ ‘রামচরিতমানস’ রচনা করেন এই ভাষায়। এইভাবে আখ্যান-কাব্য রচনায় অরবী ভাষার কবিরা যে সাফল্য লাভ করেন হিন্দীসাহিত্যে তাহা তুলনাহীন। কিন্তু ব্রজভাষার সম্মুখে অরবী সাহিত্যিক ভাষারূপে বেশিদিন টিকিতে পারিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত হিন্দীসাহিত্যের ইতিহাস প্রধানতঃ ব্রজভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাস। পিঙ্গল ও অরবী কথ্য পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্রজসাহিত্যের প্রকৃত আরম্ভ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতে। অপভ্রংশ হইতে ব্রজভাষার পূর্ণ অভিযুক্তি ঘটবার পূর্বেই ত্রয়োদশ শতকেব গোড়াতে বিদেশী আক্রমণে মধ্যদেশের গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু-রাজসভাগুলি বিলুপ্ত হইয়া যায়। রাজসভার আশ্রয়ে সাহিত্যচর্চাও বন্ধ হইয়া গেল। তাই মুসলমান শাসনের প্রথম যুগ (অর্থাৎ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক) ব্রজভাষা তথা হিন্দী সাহিত্যের অন্ধকার যুগ।

যদিও অল্পাংশ প্রমুখ আধুনিক ভারতীয় আর্ষভাষার গ্রন্থ ব্রজভাষা দশম-একাদশ শতকেই উদ্ভূত হয় এবং যদিও কোনো কোনো পণ্ডিত প্রাচীন ব্রজসাহিত্য সম্পর্কে নতুন আলোকপাতের চেষ্টা করিয়াছেন,(৩২) তথাপি হিন্দীসাহিত্যের আদিকালে ব্রজসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক নিদর্শন কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতকেই ব্রজভাষা পরিনিষ্ঠিত রূপ গ্রহণ করে এবং এই সময় হইতেই ব্রজসাহিত্যের সূচনা ও সমৃদ্ধি। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মহাপ্রভু বল্লাভাচার্যের (১৪৮০-১৫৩২) প্রেরণায় ব্রজভূমিতে যে কৃষ্ণভক্ত কবি-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে, তাঁহাদের হাতেই ব্রজসাহিত্যের লক্ষণীয় চর্চা আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টীয় ১৫০০ অব্দে বৃন্দাবনে শ্রীনাথ-মন্দিরের ভিত্তিপত্তন হইল। এই বৎসরকেই সাহিত্যিক ব্রজভাষার শিলাস্ত্রাসের কাল বলা যাইতে পারে।(৩৩)

সাহিত্যে প্রায় একই সময়ে অরবী ও ব্রজভাষার ব্যবহার শুরু হয়। তবু একথা বলিলে কিছু অত্যাুক্তি হইবে না যে, মধ্যযুগীয় হিন্দীসাহিত্যের ইতিহাস একপ্রকার ব্রজসাহিত্যের ইতিহাস। জায়সীর ‘পদ্মাবত’ এবং তুলসীদাসের ‘রামচরিতমানস’-এর কথা বাদ দিলে মধ্যযুগীয় হিন্দীসাহিত্যের প্রধান প্রধান বচনা ব্রজভাষায় লিখিত। এমন কি স্বয়ং তুলসীদাস তাঁহার গীতাবলী, বিনয়পত্রিকা, কবিতাবলী প্রভৃতি অল্পাংশ গ্রন্থ লিখিয়াছেন ব্রজভাষায়।(৩৪) আসলে অরবী ব্রজভাষার গ্রন্থ ব্যাপক কাব্যভাষা হইতে

৩২. স্বরপূর্ব ব্রজভাষা ওর উসকা সাহিত্য (১৯৫৮), শিবপ্রসাদ সিংহ

৩৩. ব্রজভাষা ব্যাকরণ, ধীরেন্দ্র বর্মণ। পৃ ১১

৩৪. ব্রজভাষা ব্যাকরণ, ধীরেন্দ্র বর্মণ। পৃ ৩২

পারে নাই। অবধ অঞ্চলের বহির্ভূত কোনো কবি অবধীতে কাব্যরচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু সাহিত্যিক ব্রজভাষার চর্চা হইয়াছিল সর্বত্র।

ইহার কারণ কী? ব্রজভাষার পূর্বে ও উত্তরে অবধী ও খড়ীবোলীর ভ্রাম্য দুইটি শক্তিশালী ভাষা থাকিতে হিন্দীসাহিত্যে ব্রজভাষারই প্রতিষ্ঠা ঘটিল কেন?

প্রধান কারণ, মনে হয়, বৈষ্ণব ধর্মের পুরস্কৃতি। কৃষ্ণ হইলেন স্বয়ং ভগবান। ব্রজধাম তাঁহার লীলাভূমি। ব্রজের ভাষা কৃষ্ণেরই ভাষা এই বিশ্বাসে কৃষ্ণভক্ত কবিরা ভজনকীর্তনের জন্য ব্রজভাষাকে অবলম্বন করিলেন। এই বিশ্বাসের ফলে এমন নিয়মের প্রবর্তন ঘটিল যে, গোপাল সেবক যে অঞ্চলের লোকই হউন না কেন, গোপালের সেবায় তাঁহাকে ব্রজভাষার ব্যবহার করিতে হইবে। (৩৫) এইরূপে বৈষ্ণব ধর্মের সহিত ব্রজভাষার সম্বন্ধ হওয়ায় তাহা কাব্যের পবিত্র ভাষারূপে প্রতিষ্ঠালাভ কবিল।

ষোড়শ শতকের গোড়ায় কৃষ্ণভক্তির আশ্রয় পাইয়া যে ব্রজসাহিত্যের সূচনা, পরবর্তী তিন শতাব্দী ধারিয়া তাহার অসুশীলন ও সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ষাঁহাদের চেষ্টায় ব্রজভাষা ও সাহিত্য পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ষোড়শ শতকের সুরদাস, নন্দদাস, অষ্টছাপ সম্প্রদায়ের অন্যান্য কবি, রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিতহরিবংশ, ভক্তমালের কবি নাভাদাস, ‘সুদামাচরিত’-খণ্ডকাব্যের রচয়িতা নরোত্তম দাস এবং মীরাবাদী, (৩৬) সপ্তদশ শতকের কবি কেশব দাস, দিল্লীর পাঠান সরদার রসখান, সেনপতি এবং জয়পুরের রাজকবি সতসদে-রচয়িতা বিহারীলাল, অষ্টাদশ শতকের মতিরাম, ভূষণ, দেবদত্ত, ঘনানন্দ, ভিখারী দাস ও পদ্মাকর।

কৃষ্ণভক্তির সাহিত্যিক শৃঙ্খল এই ব্রজভাষাতেই হইয়াছিল, এবং ব্রজভাষারও চরমোৎকর্ষ হয় কৃষ্ণভক্তিতে। কৃষ্ণভক্তি প্রকাশেব জন্য ব্রজভাষা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না এবং ব্রজভাষার পক্ষেও কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিষয় নাই। ব্রজভাষার এই সাহিত্য হিন্দী-জগতের অমূল্য রত্ন। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এমন কি উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও ব্রজভাষার কাব্যে কৃষ্ণভক্তির এই কোমল ও সুসুন্দর ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। (৩৭)

৩৫. খড়ীবোলী কা আন্দোলন (১৯৫৬), সিতিকর্ষ মিশ্র। পৃ ৫৬

৩৬. মীরাবাদীকে হিন্দী, রাজস্থানী ও গুজরাভী তিনটি সাহিত্যেই স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। তাঁহার মাতৃভাষা ছিল রাজস্থানী। কিছুকাল বৃন্দাবনে থাকিয়া তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন গুজরাতে। তাঁহার রচনায় রাজস্থানী ও গুজরাভীর মিশ্ররূপ দেখা গেলেও ব্রজভাষার প্রভাবও নিতান্ত সামান্য নয়। স্তত্রাং ব্রজভাষার ব্যাকরণকার ধীবেজ বর্মার মীরার রচনায় বিশুদ্ধ ব্রজভাষার পরিচয় না পাইলেও আমরা তাঁহাকে হিন্দী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছি।

৩৭. হিন্দী সাহিত্যিক আলোচনাত্মক ইতিহাস, রামকুমার বর্মার। পৃ ৩৫

একথা ভাবিতে বিশ্বয় লাগে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদা যে ভাষা প্রায় একছত্র অধিকার লাভ করিয়া সমগ্র হিন্দী প্রদেশে তিন শতাব্দীরও অধিককাল প্রচলিত ছিল, আজ তাহা ব্রজভূমি অঞ্চলে একটি প্রাদেশিক কথ্যভাষারূপে বাঁচিয়া আছে মাত্র।

হিন্দীভাষার যেরূপকে রাষ্ট্রভাষার সম্মান দেওয়া হইয়াছে তাহা স্বরদাসের হিন্দীও নয়, রামচরিত-মানসের হিন্দীও নয়, তাহার নাম খড়ীবোলী। বর্তমান উত্তর ভারতে খড়ীবোলী এত বিস্তার ও ব্যাপকরূপ লাভ করিয়াছে যে জনসাধারণ হিন্দী বলিতে একমাত্র খড়ীবোলীকেই বুঝিয়া থাকে। মধ্যযুগে ব্রজ ও অরধী সাহিত্যে ব্যবহৃত হইলেও বোলচালের ভাষারূপে তাহাদেব প্রচার ছিল সীমাবদ্ধ। অরধী সাহিত্যিক রূপ অবধের বাহিরে প্রচারিত হয় নাই। ব্রজভাষাও যে ব্রজমণ্ডলের বাহিরে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা কেবল সাহিত্যিক রূপে, বোলচালের রূপে নয়। কিন্তু আজ হিন্দী সাহিত্যের গতপথে যেমন খড়ীবোলী প্রাধান্য, তেমনি সমগ্র উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহাৰ ও রাজস্থানে এবং পঞ্জাবের একাংশে শিষ্ট জনতার ব্যবহারিক বিচার বিনিময়ের ভাষা খড়ীবোলী। পঞ্জাবী, বাজহানী, ব্রজভাষা-কনৌজী-বুন্দেলী, অরধী-বঘেলী-ছত্তীসগড়ী, মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরী এতগুলি বিভিন্ন ভাষা যাহারা ঘরে বলে, তাহারা এই ভাষাগুলি এখন আর শিক্ষায়, সাহিত্যে ও রাষ্ট্রগত জীবনে ব্যবহার কবে না, তাহারা নিজ নিজ মাতৃভাষার স্থানে গ্রহণ করিয়াছে সাধু হিন্দী অর্থাৎ খড়ীবোলী মাজিত রূপ। (৩৮) দিল্লী-মেরঠ অঞ্চলের মাত্র চাষি জিলাব একটি উপভাষা কীভাবে পূর্বা হিন্দী এবং পশ্চিমা হিন্দীর অন্তান্ত উপভাষার সহিত বিহারের ও রাজস্থানের উপভাষাগুলিকে গ্রাস করিয়া একরূপ প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইল তাহার একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

অতীত আধুনিক ভারতীয় আর্থভাষার শ্রায় অপভ্রংশ হইতে খড়ীবোলীরও উৎপত্তি হয় একাদশ শতকে। শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে যে ভাষাসমূহের সৃষ্টি হইল তাহার অন্যতম খড়ীবোলী। ত্রয়োদশ শতকের গোড়াতাই যে তুর্কী মুসলমান কর্তৃক দিল্লী অঞ্চল অধিকৃত হয় তাহাদের নিজস্ব ভাষা তুর্কী হইলেও ব্যবহারিক জীবনের ভাষা ছিল ফার্সী। প্রথম প্রথম এই বিজয়ী সম্প্রদায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলেও ধীরে ধীরে তাহারা ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক মেলোমেলার ফলে এবং অনেক হিন্দু ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে উত্তর ভারতের মুসলমান সমাজে হিন্দু শোণিত প্রবাহিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় তাহাদের মধ্যে ফার্সী ভাষার প্রতি অনুরাগ সবেও দেশীয় ভাষার প্রচলন হইয়া আসে এবং দুই-তিন পুরুষের মধ্যেই উত্তর ভারতের মুসলমানগণ দিল্লী অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাকে মাতৃভাষারূপে স্বীকার করিয়া



লয়।(৩২) ক্রমে ক্রমে ইহাদের মধ্য হইতেই ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে—অমীর খুসরো, আকবর, ফৈজী, আবুল ফজল, আব্দুরহীম খানখানা, দারামশিকোহ প্রভৃতি।(৪০)

সেই যুগে পাবস্তের মুসলমান সিক্কনদের ঘাটিকে বলিত হিন্দ এবং ভারতীয় মুসলমানদের বলিত হিন্দী অর্থাৎ হিন্দের অধিবাসী। অমীর খুসরো ( ১২৫৫-১৩২৪ ) 'ভারতীয় মুসলমান' অর্থেই 'হিন্দী' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন।(৪১) সাধারণ ভারতবাসী হইল হিন্দু এবং ভারতীয় মুসলমান হইল হিন্দী। ক্রমে তাহাদের ব্যবহৃত ভাষার নামও হয় 'হিন্দী'।(৪২) সুতরাং দেখা গেল ভাষার অর্থে হিন্দী শব্দের প্রথম প্রয়োগ হয় মুসলমানদের মুখে এবং শব্দটির প্রাচীনতা সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নাই।(৪৩)

তুর্কী বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া উত্তর-ভারতের রাজপুত রাজস্ববর্গের সরকারী ভাষা ছিল শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংশ। সাহিত্যিক ভাষারূপে মহাবাহু হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি ছিল বলিয়া জানা যায়। এই পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতেই ব্রজভাষা ও খড়ীবোলী দুয়েরই উদ্ভব ঘটে। দিল্লী অঞ্চলের ভাষা ( যাহা খড়ীবোলী নামে অভিহিত হইতেছে ) আরবী-ফার্সীর মিশ্রণে নতুন 'হিন্দী' নাম গ্রহণ করিলেও প্রথম প্রথম কি হিন্দু কি মুসলমান কেহই সে ভাষা সাহিত্যে ব্যবহার কবে নাই। মুসলমানরা ব্যবহার করিত ফার্সী, হিন্দুবা ব্যবহার করিত বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা—ডিকল, পিকল, ব্রজভাষা, অবধী ইত্যাদি। ক্রমে ব্রজভাষাই হইল সাহিত্যের প্রধান বাহন। এমন কি মুসলমান কবিরাও ব্রজভাষার মাধুর্যে আকৃষ্ট হইতে থাকে। আব্দুরহীম খানখানা ব্রজসাহিত্যের একজন

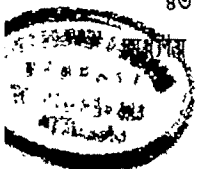
৩২. কেহ কেহ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বহিরাগত মুসলমানগণ প্রথমে পঞ্জাব অধিকার করে এবং সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে তাহারা পঞ্জাবের তৎকাল-প্রচলিত ভাষাকেই গ্রহণ করে। সুতরাং ফার্সীমিশ্র দেশীভাষা লইয়াই তাহারা পঞ্জাব হইতে দিল্লী আসে। বর্তমানে পূর্বপঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের ভাষাগত পার্থক্য বেশি নয়। ৮৯ শত বৎসর আগে এই পার্থক্য ছিল খুবই কম। সুতরাং খড়ীবোলীর প্রসঙ্গে পঞ্জাব ও দিল্লীর পার্থক্যে বিশেষ যায় আসে না। (Indo-Aryan and Hindi, S. K. Chatterjee, p. 164)

৪০. দ্বিবেদী অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃ ১২৪-১২৫

৪১. It (Hindi) is a Persian, not an Indian word, and Persian writers used it to denote a native of India, as distinguished from Hindu or Non-musalman. —L. S. I. Vol. I, Pt. I, p. 166

৪২ হিন্দীসাহিত্যকা বৃহৎ ইতিহাস (প্রথম ভাগ), পৃ ১

৪৩ হিন্দী ভাষাকা উদ্গম ওয় বিকাশ (১৯৫৫), উদয়নারায়ণ তিবারী। ষষ্ঠ



প্রসিদ্ধ কবি। সম্রাট আকবরও ব্রজভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। (৪৪) এইভাবে একদিকে ফার্সী ও অত্রদিকে ব্রজভাষার চাপে খড়ীবোলী সাহিত্যিক মর্যাদালাভে বঞ্চিত হইয়া বহিল।

উত্তর-ভারতে যে গৌরব জুটিল না, খড়ীবোলীর সেই গৌরবলাভের স্বৰ্ণোৎসব ঘটিল দক্ষিণভারতে। চতুর্দশ শতকের গোড়া হইতে (আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে) দক্ষিণভারতের অভিমুখে মুসলমানদের আক্রমণ পরিচালিত হয়। কিছুকাল পরে তুগলক বংশের খেয়ালী সুলতান মুহম্মদ তুগলক দিল্লী হইতে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী পতিবর্তন করিয়া দিল্লীর সকল অধিবাসীকে জোর করিয়া সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। আট বৎসর পরে সুলতান সদলবলে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেও দক্ষিণ-ভারতে ধীরে ধীরে মুসলমানদের একটি স্থায়ী কেন্দ্র গড়িয়া উঠে এবং চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে (১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সুলতানদের বহমনী রাজ্য। পরবর্তী কালে এই বহমনী রাজ্য বিভক্ত হওয়াতে যে পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত হইল, তন্মধ্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাই মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। তৎকালীন গোলকুণ্ডার রাজধানী হায়দরাবাদে অভাবধি সেই ধারা চলিয়া আসিয়াছে।

দক্ষিণ-ভারতেব মুসলমানদের কথ্যভাষা ছিল দিল্লী অঞ্চলের খড়ীবোলী হিন্দী। ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থপাদ হইতে ইহাদের সাহিত্যরচনার একটি নূতন বৈশিষ্ট্য দেখা দিল— ফার্সীর পবিবর্তে কথ্যভাষাকেই ইহার সাহিত্যচর্চার বাহন করিয়া লইলেন। কিন্তু ফার্সীর প্রভাব পুরাপুরি কাটাওয়া উঠা ইহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। এইভাবে খড়ীবোলী হিন্দীর সহিত আরবী-ফার্সীর মিশ্রণে যে নূতন কাব্যভাষা জন্ম লাভ করিল তাহার নাম হইল রেখতা অর্থাৎ মিশ্রভাষা। (৪৫) কুতব-শাহী বংশের মুহম্মদ কুলী খান ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন—তাঁহাকেই রেখতার প্রথম কবি বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা

[ক্রমঃ]

৪৪. কবিতা-কৌমুদী, পহ্লা ভাগ; (অষ্টম সংস্করণ, ১৯৫৪), রামনরেশ ত্রিপাঠী।

৪৫. খড়ীবোলী হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৫), ব্রজব্রহ্ম দাস

## শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতা

শ্রীভবতোষ দত্ত

‘সাধনা’ পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ ‘যুগান্তর’ উপভাষাস্থানির সমালোচনা করে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ঔপন্যাসিক পরিচয়টিকে অমর করে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কবি-পরিচয়টিকে আজ বিশেষ কেউ মনে রাখেন নি। পাঠশালা-পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁর ‘চৈতন্তের সন্ন্যাসে’র কোনো কোনো পংক্তি হয়তো একেবারে বিস্মৃত হয় নি কিন্তু পরিণততর রসবোধে শিবনাথ শাস্ত্রীর মূর্তি আমাদের কাছে যেমন উজ্জ্বল, তাঁর কবিমূর্তি সেই অল্পপাতেই নিম্প্রভ।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে শিবনাথ যখন এফ-এ পরীক্ষা দিয়েছেন, সেই বৎসবেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘নির্বাসিতেব বিলাপ’। তার আগেই সোমপ্রকাশে এই কাব্যের অংশ প্রকাশিত হয়ে তাঁর কবিখ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আত্মচারিতে তিনি বলেছেন : “এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহে সোমপ্রকাশে কবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল। কয়েকবার প্রকাশিত হইতে না হইতেই চারিদিকে সমালোচনা উঠিয়া গেল। পথেঘাটে ভাড়াটে গাড়িতে লোকে বলিতে লাগিল ‘এ শ্রীশিঃ কে হে?’ শিবনাথের এই কবিখ্যাতি যে কতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল, কবি নবীনচন্দ্র সেনও তার সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন। নিজেব কবিতা প্রকাশের উপলক্ষ বর্ণনা করতে গিয়ে নবীনচন্দ্র লিখেছেন : “পরদিন কলেজের পর উমেশ তাহার একটি সহপাঠীকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত। সহপাঠী ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকায়, শ্রামবর্ণ; আমাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ।\* মূর্তিখানিতে সৌন্দর্য কিছুই নাই; ভাবমার্ধ্ব আছে। মুখখানি সবল সুন্দর স্নেহময়। দেখিলেই প্রীতি হয়। ইনি স্বনামখ্যাত পুজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র, সেই বয়সেই কবি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার ব্রাহ্ম শাস্ত্রীমূর্তি বড় একটা দেখি নাই কিন্তু তাঁহার সেই কিশোর কবিমূর্তি আমি ভুলিতে পাবি নাই। উমেশ ও শিবনাথ বলিলেন তাঁহারা আমার সেই কবিতাটি এডুকেশন গেজেটে ছাপিতে দিবেন।”† কবিতাটির নাম ‘কোন বিধবা কামিনীর প্রতি’। এই কবিতাটি ‘বিধবা কামিনী’ নামে অবকাশরঞ্জিনীর (১ম ভাগ) অন্তর্ভুক্ত হয়। হিতবাদী সংস্করণে তার তারিখ দেওয়া আছে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং শিবনাথ তার আগে থেকেই কবিতা লিখছেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি সুপরিচিত কাব্য বেরিয়েছে, পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮),

\* আসলে নবীনচন্দ্র এবং শিবনাথ সমবয়সী ছিলেন। দুজনেরই জন্ম ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে।  
—বর্তমান লেখক।

† ‘আমার জীবন’ (২য় ভাগ, ১৩১৬) পৃঃ ১৪১

চিন্তাতরঙ্গিনী ( ১৮৬১ ), বীরবাহু কাব্য ( ১৮৬৪ ), মেঘনাদবধ কাব্য ( ১৮৬১ ), তিলোত্তমাসম্ভব ( ১৮৬০ ) এবং ব্রজাঙ্গনা ( ১৮৬১ ) । এই কাব্যগুলি সবই প্রায় কাহিনীকাব্য । আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম যুগের কবিদের সঙ্গেই শিবনাথ তাঁর কাব্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন । যদিও পরবর্তী কাব্য রচনার সময়ে বিহারীলাল ঞ্জয় বড়াল রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিদের গীতিকাব্য রচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, শিবনাথ এই সময়ে খণ্ড কবিতার দিকে প্রবণতা দেখালেও প্রথম যুগের কাহিনী ধর্ম থেকে একেবারে মুক্ত থাকতে পারেন নি ।

আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে শিবনাথ যে যুগে কবিতার শিক্ষানবিশি করেছিলেন সেটা ছিল ঈশ্বর গুপ্তের যুগ । এ বিষয়ে শিবনাথের জীবনী থেকেও কতকগুলি স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় । শিবনাথের মাতামহ হরচন্দ্র ছায়রত্নের কলিকাতা কঁসারিপাড়াতে টোল চতুষ্পাঠী ছিল । হরচন্দ্র সংবাদপ্রতাকর পত্রিকা সম্পাদনে ঈশ্বর গুপ্তকে সাহায্য করতেন । এ কথা ঈশ্বর গুপ্ত নিজেই উল্লেখ করেছেন । হরচন্দ্র এবং ঈশ্বর গুপ্ত দুজনেই হাতিবাগানের কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র ছিলেন ।\* হরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সোমপ্রকাশের সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ । সুতরাং শিবনাথের সঙ্গে সংবাদপ্রতাকরের যোগ গুপ্ত কালের নয়, প্রায় পরিবারের । তাঁর সাহিত্যিক রসবোধ তৈরি হয়েছিল দেশীয় আদর্শে । পণ্ডিত বংশের সন্তান বলে সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে যোগ ছিল স্বাভাবিক, তেমনি মধ্যযুগের বাংলা কাব্যধারার সঙ্গে যোগও ছিল ঘনিষ্ঠ । শিবনাথ তাঁর বাল্যের কথায় বলেছেন : “ফলত আমি যে কত ছোট বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা মনে নাই । বর্ণপরিচয় হইলেই মা আমাকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন অথবা নিজে মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন । সেই সকল কবিতা আমার কানে লাগিয়াছিল । তৎপরে কলিকাতাতে আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা কোনো প্রকারে হাতে পাইলেই গিলিয়া খাইতাম । তৎপরে আমার বাবা রসগ্রাহী মানুষ, তিনি বন্ধুদের সহিত ভারতচন্দ্র প্রভৃতির কবিতার সমালোচনা করিতেন । এই সকল কারণে আমার শৈশব হইতে কবিতা লিখিবার বাতিক জাগিয়া থাকিবে ।”

বলা বাহুল্য ‘নির্বাসিতেব বিলাপে’র কাহিনী-রীতি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে ছিল না । এর ভাষা ছন্দ কোনো দিক দিয়েই শিবনাথ যে ঈশ্বর গুপ্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা বলা যায় না । এই কাব্যের ভাষায় কিছু কিছু মধুসূদনের প্রতিক্রিয়া থাকলেও প্রভাব যে কিছু মৌলিক তা বলা চলে না । অবশ্য মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক । কাহিনী অবলম্বন করে কোনো বক্তব্যকে উপস্থাপিত করবার পদ্ধতি আমাদের আধুনিক কাব্যের প্রথম দিকে ছিল স্বাভাবিক । তখন গীতিকাব্যের প্রসার সে রকম ঘটে নি— আখ্যানমূলক কবিতারই তখন প্রসার ঘটেছিল । আখ্যানকে কাব্যবস্তুরূপে গ্রহণ করার মূলে হয়তো একাধিক কারণ ছিল । মধুসূদন যুরোপীয় মহাকাব্য এবং ভারতীয় মহাকাব্য

\* হেমলতা দেবী—‘পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত’ ( ১৩২৭ ) পৃ ৫০ ।

মিলিয়ে কাব্যের পরিকল্পনা করলেন, রচনা করলেন আমাদের দেশীয় মঙ্গলকাব্য আর ইংরেজী পদ্মকাহিনীর (verse-tale) মিশ্রণ। হেমচন্দ্রের কাব্য তখনও পর্যন্ত পুরোপুরি মহাকাব্যের অঙ্গুত না হলেও পদ্মকাহিনীই অল্পবর্তন করেছিল। এই আখ্যানকে অবলম্বন করেই প্রাচীন ইতিহাস, দেশাত্মবোধ, সমাজকল্যাণ নারীপ্রগতি ইত্যাদি অনেক রকম চিন্তাকেই সুসম্পূর্ণরূপে ধরে দেবার রীতিরও প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল। চরিত্র-কল্পনা এবং কাহিনী সহযোগেই এসব বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন ঘট আকর্ষণীয় হয়, গীতিকবিতার আশ্রমের উৎসারে তত সহজ হয়তো হয় না। আমাদের গীতিকবিতার ইতিহাসও ত্রো নেহান্ত অর্বাচীন নয়। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তগান, বাঙাল গান প্রভৃতি গীতিকাব্যিক বৈচিত্র্য এবং প্রসারও কিছুমাত্র অকিঞ্চিৎকর ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত সেদিকে ঝুঁকলেও পরের কবিরা সেদিকে ঞ্জস্ক্য দেখালেন না। মুখ্যত আখ্যানকাব্যের দিকেই যুগপ্রেরণা সংঘত হচ্ছিল। মনে হয় কারণটা খানিকটা প্রতিক্রিয়ামূলক। ইংরেজি সাহিত্যের বসাস্থাননে ধারা পটুতা অর্জন করেছিলেন এবং নতুন রুচি ও আদর্শে ধারা দীক্ষা পেয়েছিলেন বাংলা বিকৃত সংগীত-রূপ তাঁদের কিছুমাত্র উৎসাহিত করতে পারে নি। সেইজন্যই ইংরেজি সাহিত্যে অপটু ঈশ্বর গুপ্ত চটুল গীতি বা ছড়াকে মূলত আশ্রয় করলেও তাঁর জীবিতকালেই মধুসূদন প্রভৃতি কবি সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শকে গ্রহণ করলেন। এই আদর্শ হল আখ্যানকাব্যের বিদেশী আদর্শ। কাহিনী-কাব্যের একটা দেশীয় আদর্শও ছিল; কিন্তু নীতিহীনতা এবং আদিরসের প্রাচুর্যে নতুন রুচির কাছে স্বাভাবিক কারণেই তা হল বর্জনীয়।

আখ্যানমূলক কাব্য রচনার উৎসাহ দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনী, মধুসূদনের চতুর্দশপদী, বিহারীলালের সঙ্গীতশতক প্রভৃতি কাব্যধারায় লিরিকের মুক্তি ঘটল কিন্তু লিরিক পুরোভাগে এসে দাঁড়াবার আগে আখ্যান কাব্যের যুগে শিবনাথের প্রথম বইখানি বেরোল। কিন্তু আখ্যানকাব্যের সাধারণ প্রেরণা এবং আদর্শের যে পরিচয় পাওয়া গেল, শিবনাথের এই বইটার সঙ্গে তার সে রকম যোগ নেই। সেদিক থেকে এই বইটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এমন কি একথাও বলা অসম্ভব হবে না যে এই বইটা একটা নতুন ধরনের কাব্যের সূচনা করেছিল। ‘নির্বাসিতের বিলাপে’ কাহিনী যে সে রকম জটিল বা বাস্তবধর্মী, তা নয়। বাস্তব ঘটনার সামান্য ভূমির উপর আগাগোড়া কল্পনার একটা প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। ভূমিকাতে লেখক কাব্যের উপলক্ষটি বলে দিয়েছেন। বিশেষ কোনো অপরাধে ভবানীপুরের এক যুবকের নির্বাসন দণ্ড হয়। প্রথম কাণ্ডে আন্দামানের সমুদ্রতটে নায়কের মনস্তাপ এবং বায়ুকে দূত করে গৃহে পাঠানো। দ্বিতীয় কাণ্ডে আছে এক নাবীর আবির্ভাব। তিনি বন্দীকে দেখালেন মুক্তির উপায়। প্রলুব্ধ হয়ে বন্দী এই মোহিনীর মায়ায় ধরা দিলেন। কবি শেষে অল্পক্ষেপে বলছেন :

হে ক্রীশ। চিনেছ কি কুরঙ্গনয়না

একে বামা বিনোদিনী স্খাৎসবদনা ?

ইনি সেই মায়াবিনী আমার নয়নে  
 বহিলে সলিলধারা, যিনি তব মনে  
 বুঝাইয়া যুহুভাবে করেন সাস্বনা  
 যারে দেখে যায় ভাই অর্ধেক যাতনা।  
 চিনেছি তোমারে যোরা চিনেছি কামিনী  
 জুবনমোহিনী তুমি আশা মায়াবিনী।

তৃতীয় কাণ্ডে নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে চলেছে বন্দী। ছুজনে উঠল নোকায় উত্তাল সমুদ্র উত্তরণের আশায়। এ দিকে ঝড় উঠল। চতুর্থ কাণ্ডে সমুদ্র থেকে নৌকা এসে পড়ল নদীতে। সেই নদীপথে তাবা এসে উঠল এক বৃহৎ প্রাসাদের প্রাঙ্গণে উৎসবে। সেখানে যেন কবিও উপস্থিত। কিন্তু তার পরেই প্রলয় এবং স্বপ্নভঙ্গ। লেখক বলছেন : “স্বপ্নাংশটি একটা ধারাবাহী রূপক। আশার সাহায্যে বিষাদলাগর ও বিপদের ঝটিকা উত্তীর্ণ হইয়া মল্লভূত কিরূপে মনে মনে কল্পিত স্বপ্নভোগ কবে এবং পরে যুক্তির বলে সে স্বপ্নের স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে কিরূপে নিজ অবস্থার জ্ঞাত প্রস্তুত হয়, ইহাতে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে।” এই ব্যাখ্যাটি কৌতুকজনক। পাঠকেরা বুঝতে পারবেন, এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবু ব্যাখ্যা যোজনা করা সেকালের পক্ষে দরকার ছিল। সে যুগটা উদ্বেগহীন রোমান্স সৃষ্টির যুগ ছিল না। কাব্যের সঙ্গে ব্যবহারিক উদ্বেগের আভাস না থাকলে সে কালে রচনা যেন সার্থক হত না। প্রয়োজন বিরহিত কাব্যের কবি বলেই বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের এমন উদার প্রশস্তি লাভ করেছিলেন।

‘নির্বাসিতের বিলাপে’ রোমান্টিক স্বপ্নই মুখ্যত কাব্যরস সৃষ্টি করেছে। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে একটা গল্পের রোমান্স তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতাটির মধ্যে যে ধরনের স্বপ্নসংস্করণের কথা আছে, এও যেন সেই বকম। নির্বাসিতের বিলাপের রূপক কাহিনী পড়তে গিয়ে সেই পরিবেশ এবং কল্পনাকেই মনে পড়ে। রহস্তময়ী নারীর সঙ্গে উত্তাল সমুদ্রে দিক্‌হীন যাত্রা, ঝড়ে মৃত্যুর ইঙ্গিত, সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে বিশাল প্রাসাদে ছুজনের উপস্থিতি, নতুন দেশের নতুন রাজসভায় হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার এবং সেখানে কবির উপস্থিতি—এই বিচিত্র রূপক কল্পনা সেকালের কাব্যে ছিল অভিনব। অবশ্য ‘সিন্ধুতীরে’র অবগুপ্ততা নারী অশ্বারোহণে যাত্রা এবং বিজ্ঞান পরিত্যক্ত প্রাসাদ যতখানি অবাঞ্ছিত রহস্তময়তার কুহক সৃষ্টি করে পাঠককে কল্পনাস্রব করে তোলে ‘নির্বাসিতের বিলাপে’ অবশ্যই সেই কুশলতার পরিচয় নেই। তবু ঠিক এই ধরনের রোমান্টিক রূপক বাংলা কাব্যে আর দেখা যায় নি। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা জাতীয়তামূলক কাহিনী নয়, এমন কি কোনো একটা পরিণত গল্পও নয়, শিবনাথ এই কাব্যটির মধ্যে একটা নতুন ধরনের রোমান্স সৃষ্টি করলেন এবং তার মধ্যে কল্পনাকে দিলেন অবাধ গতি। বাংলা সাহিত্যে এর পরে অনেকেই রূপক-রীতি অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন। কেউ কেউ

‘Bengali Symbolist movement’-এরই উল্লেখ করেছেন।\* শিবনাথের পর এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্বপ্নপ্রয়াণ’ (১৮৭৫)† এবং হেমচন্দ্রের ‘আশাকানন’ (১৮৭৬)। সেকালের ছোটখাট কবিদের বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথকে রূপকের অগ্রচুর ব্যবহার করতে দেখি। রবীন্দ্রনাথের রূপক কবিতা প্রধানত রচিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে ‘সোনার তরী’ ‘চিত্রা’র যুগে।‡ রবীন্দ্রনাথ রূপকের ব্যবহার করেছেন উদ্দেশ্যহীন কাব্যরস সৃষ্টির জন্ত। তাঁর আগের কবিদের কাব্যে রূপকের ছিল নীতিগত প্রয়োজনে। রূপকের একটা স্থূল বাস্তব অর্থ না রেখে তাঁরা পারতেন না। সেটা না রাখলে কবিতা যেন নেহাতই কল্পনার ফাহুসে পরিণত হয়। কাব্যে পুরাণ ইতিহাস নীতির স্পর্শ না থাকলে সেকালে কবিতা সার্থক হল না মনে হত। ‘নির্বাসিতের বিলাপে’ও রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত এর একটা অর্থ নিষ্কাশিত করতেই হয়। সে বিষয়ে লেখক নিজেই ভূমিকায় পাঠককে সহায়তা করেছেন। কাব্যে কল্পনা বস্তুটা যে কতখানি নিরবয়ব হতে পারে খুব সম্ভব এ যুগে এর কোনো ধারণাই ছিল না। কল্পনা নতুন সাহিত্যে এসেও ঠিক যেন পাখা মেলতে পারছে না। এই জন্ত রূপকের আবরণ দরকার। কারণ কল্পনাকে অজ্ঞ কোনো একটা অর্থের ভার বহন করে স্বার্থক হতে হবে। ‘নির্বাসিতের বিলাপে’ বায়রনীয় উচ্ছ্বাস আছে—সেকালের রোমান্স রচনার এটা একটা সাধারণ লক্ষণ ছিল। তা ছাড়া নায়কের মরবিড স্বভাবটি এবং আশাতন্ডের নিদারুণ নৈরাশ্য সে যুগের কাব্যের স্বাভাবিক বিষাদপ্রবণতার সঙ্গে এক সূত্রে গাথা। হেমচন্দ্রের চিন্তাতরঙ্গিনীর সঙ্গেও এর একটা স্পীণ সাদৃশ্য আছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী তখনও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন নি। তখনও নানা কর্মপ্রেরণা এবং কর্তব্যের দায়িত্ব তাঁর মনকে ভারগ্রস্ত করে নি। তখনও তাঁর মনে তরুণ কল্পনার নিশ্চিন্ত বিলাস। প্রথম কাব্যে তাই দেখা যায় ভাষা ছন্দ কল্পনার প্রতি তাঁর মনোযোগ। বিপিনচন্দ্র পাল পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, “কলত: তাঁহার আপনার স্বরূপে শিবনাথ তত্ত্বজ্ঞানী নহেন, ভগবদ্ভক্ত নহেন, চিন্তাশীল দার্শনিক নহেন, মুমুক্শু সাধক নহেন কিন্তু অসাধারণ শব্দসম্পদশালী সাহিত্যিক ও সুরসিক কবি।” এই উক্তি মध्ये কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও শিবনাথের শব্দসম্পদ তাঁর প্রথম কাব্যের প্রসঙ্গে একেবারে উপেক্ষনীয়

\* P. Guha Thakurata, *Bengali Drama*, 1930, p. 219

† স্বপ্নপ্রয়াণের প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্ণ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রহস্তসন্দর্ভ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : নব পর্বাবলী রহস্তসন্দর্ভ, ১২৮০, ১ পর্ব, ৫ খণ্ড, পৃ. ৭২-৮১। ১২৮০ সালের প্রারম্ভ সংখ্যার বঙ্গদর্শনেও প্রথম স্বর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল।

‡ এই প্রসঙ্গে মোহিতলালের উক্তি স্মরণযোগ্য—“ঐ রূপকগুলি কাব্যকলার দিক দিয়া একটি উৎকৃষ্ট ভঙ্গি হইলেও ঐরূপ কল্পনা রবীন্দ্র কবিমানসেরই একটি প্রকৃতিগত লক্ষণ।”—কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫।

নয়। মধুসূদনের মত তাঁর কাব্যে ধ্বনিবাহুল্য না থাকলেও শব্দশুচিতা রক্ষার দিকে তাঁর বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। ভাষাশিল্পে মধুসূদনের মত তাঁর অতথানি কৌতূহল কিংবা শক্তি ছিল না বলে তাঁর নিজের স্টাইল সে রকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। মৌলিক কল্পনাকে রূপ দেবার কবিশক্তি থেকেই রূপক উপমা কিংবা নতুন শব্দ তৈরি হয়ে ওঠে— প্রচলিত ছন্দের মধ্যে ব্যক্তিত্বের আভা ফুটে ওঠে। এ সবই মধুসূদনের ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আতিশয্য ঘটে থাকলেও মধুসূদনের ধ্বনিসংগীত যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, সেটা নিছক ছন্দকৌড়ার জন্ত নয়। পয়ারকে ভেঙে মধুসূদন যে নতুন ছন্দ তৈরি করেছিলেন, শিবনাথ তাকে গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছেন, “বাস্তবিক তখন আমার কবিতাব মধ্যে একটি নতনত্ব ছিল। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাঁধা মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোলা অমিত্রাক্ষর ছিল না কিন্তু দুইয়ের মধ্যস্থলে যাহা তাহাই ছিল। ভাবকে ছন্দের বশবর্তী না করিয়া ছন্দকে ভাবের বশবর্তী করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ, এই জন্ত ইহা তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।” শিবনাথের এই নতনত্বের মধ্যে খানিকটা কবিত্বের গণা ছিল সন্দেহ নেই। কারণ উচ্ছ্বাসপূর্ণ রোমাণ্টিক কল্পনার পক্ষে প্রবাহমানতার সঙ্গে অস্তিত্বপ্রাপ্তির নৃপুংস ধ্বনিত হওয়া দরকার। এ বিষয়ে নবীনচন্দ্রের সঙ্গেও শিবনাথের মিল আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে সমুদ্রকে সন্ধান করে রাবণের যে আক্ষেপ, তার সঙ্গে ‘নির্বাসিতের বিলাপের’ নায়কের অল্পরূপ আক্ষেপকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। এই তুলনার সাহায্যেই কবিশক্তির পার্থক্য বুঝতে পারা যায়। রাবণের উক্তিতে ‘প্রচেষ্টা’ ‘প্রভঞ্জনবৈরী’ ‘বীতংস’ ‘কৌন্তভরতন যথা মাধবের বৃকে’ এমন কি আপাতহাস্যকর ‘জাঙাল’ (ঘৃণাসূচক)—এই শব্দগুলি আভিধানিক কিংবা নিছক আলাপ্যক বলে তুচ্ছ করলে চলে না। এই শব্দগুলির মধ্যে দিয়ে রাবণের চেহারা ফুটে উঠেছে এবং তার সঙ্গে কবিমনের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। মিল বাদ দেওয়ার অসংযম শাসিত হয়েছে এই অর্থপূর্ণ শব্দব্যবহারের দ্বারা। এটাই মধুসূদনের স্টাইল। শিবনাথের কাব্যে এই শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই নেই। কিন্তু তাঁর এই কাব্যে কল্পনার একটা মধ্যবর্তিতা আছে, সেটা উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ কাণ্ডে একশ বাইশ লাইনের এক দীর্ঘ উষা বর্ণনা আছে। এই বর্ণনার আরম্ভ এই রকম—

এ দিকে পোহায় দেখে স্থবিতাবরী  
লোহিত বরগী উষা, আলিয়া হৃন্দরী,  
সখিতাবে দিয়া কর পূর্বাশাব গলে,  
হাসি হাসি দাঁড়াইল উদয় অচলে।  
হেরে সে যুগল রূপ হিংসায় যামিনী  
ক্ষতপদে অন্তাচলে চলে বিনোদিনী।  
একেবারে স্থবরাজ্য করি পরিহার  
যাইতে সরে না মন ; তাই অন্ধকার  
যায় যায় যায়, যেন যাইতে না চায়  
নিশার অঞ্চল রূপে পশ্চাতে লোটায়া।

এই বর্ণনাটির সঙ্গে সেকালের দুটি বিখ্যাত বর্ণনা তুলনীয়, একটি মেঘনাদবধ কাব্যের সপ্তম সর্গে আর একটি বিহারীলালের নিশান্ত সংগীতে। দুটি বিপরীত প্রান্তের। মধুসূদনের বর্ণনা চিত্রশূণ্যসম্পন্ন পৌরাণিক প্রসঙ্গ-সমৃদ্ধ। শিবনাথ একেই অম্লসরণ কবেছেন। নিশাবাসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি-জগতের জাগরণের বিশদ বর্ণনা কবিত্বাভিনিবন্ধে ক্লাসিক রীতিবই অম্লগত। মধুসূদন যে এই বীতি অবলম্বন করে সার্থক হয়েছেন, তার কারণ অন্তরে অন্তরে তিনি প্রাচীন কবিদের উত্তরাধিকারই পেয়েছিলেন। শিবনাথের পক্ষে সেটা ছিল আহত, তাই তাঁর বর্ণনা নেহাতই আলাংকারিক। বিহারীলালের উষা বর্ণনাটি বস্তুজগৎ এবং ভাবজগৎ উষা এবং কবিপ্রিয়্যার মেশামেশিতে অপূর্ব—খাঁটি লিরিক। বাংলা সাহিত্যে এই রীতি এই প্রথম। শিবনাথের কাব্যের সীমাসম্পন্ন প্রকৃতিরূপ আর উচ্ছ্বাসময় ভাবাবেগ বাংলা কাব্যে দুই রীতির মিলন ঘটতে না পারলেও পাঠকের কোতুলকে উদ্ভিক্ত করে সন্দেহ নেই।

আমাদের মনে হয় ‘নির্বাসিতের বিলাপ’ কাব্যেই শিবনাথের কবিশক্তির চরম পরিচয়টি নিহিত। এব পরেও তিনি কাব্য লিখেছেন, কিন্তু প্রথম কাব্যখানিতে যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছে, সেটা পরিণত না হতে পাবে, কিন্তু সে যে বিশেষত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ কবি না। আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এই বইটিব তাৎপর্য কেমন, সে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। শিবনাথ এই শক্তিব যথোপযুক্ত করণ করেন নি বলেই মনে হয়। নীতির গুরুভারে কবিতা হল অলঙ্গতি। ইতিমধ্যে বিশুদ্ধ গীতিকাব্য বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সেই সঙ্গে আখ্যান-কাব্যেরও চর্চা অব্যাহত। শিবনাথের নাম এঁদের মধ্যে উচ্চারিত হতে শুনতে পাই না। কিন্তু সেকালে কবি রূপে শিবনাথ একেবারে বিশ্বত হন নি। কোনো সমালোচক বলেছিলেন, “এই কাব্যে (হিমাদ্রিকুসুম) ও তৎপ্রণীত ‘পুষ্পমালা’ কাব্যে শিবনাথবাবুর নিসর্গের সৌন্দর্য, ধর্মের গান্ধীর্ষ, হৃদয়ের সৌকুমার্য, চরিত্রের ঐশ্বর্য, কল্পনার মাদুর্য ও দেশভক্তির প্রাচুর্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছি।...শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতাসমূহের মধ্যে দুই প্রণয়ের আবিলতা, ইংরাজী কবির নিকট অল্পকরণ প্রবণতা দেশহিতৈষিতার ভাণ ও আলো-আধারে কবিতার লেশমাত্রও নাই। তাঁহার কাব্যসমূহ যারপরনাই স্বকৃতিসম্পন্ন ও সম্ভাবপূর্ণ। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী একজন প্রকৃত হৃদয়বান্ ধার্মিক কবি।”\* তথ্য হিসাবে এই সমালোচনার কোনো কথাই অস্বীকার করবার নেই। কিন্তু রসসজ্জানী পাঠকেরা হয়তো এতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হবেন না। যে মাদকতা নিয়ে তিনি প্রথম কাব্যচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার তীব্রতা হ্রাস পেয়ে এল। তিনি আরও চারখানি কাব্য লিখেছিলেন, পুষ্পমালা (১৮৭৫) হিমাদ্রিকুসুম (১৮৮৭), পুষ্পাঞ্জলি (১৮৮৮), ছায়াময়ী পরিণয় (১৮৮৯)। শিবনাথ শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯২২-এ শিবনাথের একটি নির্বাচিত কবিতাসংকলন

\* নব্যভারত, ১২৯৫ আবার, ‘ইংরাজশাসনে বঙ্গসাহিত্য’—হেমনাথ মিত্র।

প্রকাশ করেছিলেন ‘শিবনির্মাল্য’ নামে। এই বইয়ের ভূমিকায় বিজয়চন্দ্র যে কথাগুলি লিখেছিলেন, তাতে শিবনাথের কাব্যের দোষগুণ দুই-ই প্রকাশ পেয়েছে, “কবি সত্য সত্য যাহা ভাবিতেন যে সংকল্প বুকে বাঁধিয়া সংসারের সেবা করিতেন সেই কথাগুলিই কবিতায় লিখিয়াছেন। তিনি বুধা খেয়ালের কবি ছিলেন না। একটা সৌন্দর্য্যষ্টির নামে যাহা খুসি তাহাই কথা সাজাইয়া লেখেন নাই। এইজন্য তাঁহার কবিতায় কথার চটক নাই, আছে ভাবের মাদুরী ও প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস।”

বিজয়চন্দ্রের এই কথাগুলি প্রযোজ্য ‘নির্বাসিতের বিলাপে’র পরের কাব্য সম্পর্কেই। প্রথম বই রচনার সময় তিনি ছিলেন ভাবনামুক্ত সাহিত্যিক। পরে তিনি অবতীর্ণ হলেন কর্মনেতাকল্পে। তাঁর সমস্ত মনোযোগ এই দিকেই নিবদ্ধ হ'ল। ‘যুগান্তর’ উপস্থাপন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক, ছিলেন ডাবুক হইলেন নীতিপ্রচারক।” রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি শিবনাথের পরবর্তী কাব্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। শিবনাথের বইয়ের ভূমিকা পড়লে বেশ বুঝতে পারা যায় তিনি সচেতনভাবে নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্যেই কবিতা লিখতেন। তিস্ত বিস্তৃত কাব্য যে উদ্দেশ্যবিরহিত প্রেরণা থেকেই আসে এটা যে তিনি জানতেন না তা নয়\* তবু তাঁর কাব্য যে ভিন্নমুখী, তাঁর শিক্ষকতা এবং কর্মমোহের এটাটাই ছিল পরিণাম। তাঁর কবিশক্তিকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সুন্দরী সুন্দর’ কবিতার একটি প্যারডি তিনি সোমপ্রকাশে প্রকাশ করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন শিবনাথ শাস্ত্রীর ওই কবিতার বিজ্ঞপশক্তি এবং উজ্জ্বল কবিপ্রতিভার প্রমাণ পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র বিস্মিত হয়েছিলেন।† শিবনাথ অতঃপর যে ছোট বড় কবিতা লিখেছিলেন তার থেকে এ রকম একটা সন্দেহ হয় যে তাঁর কবিপ্রেরণার আত্মপ্রকাশের সহজ অবলম্বন ছিল কাহিনী। তাঁর সব কবিতার মধ্যেই গল্পের আভাস পাওয়া যায় বললে ভুল হবে না। এ বিষয়ে তিনি সেকালের কবিদের থেকে বিশেষ আলাদা ছিলেন না। যে সব কবিতা অনেকটাই ভাবধর্মী, সে সব কবিতাতেও এক ধরনের নাটকীয়তার আভাস থেকে যায়। হেমচন্দ্রের ‘হতাশের আক্ষেপ’ কিংবা ‘দূর কাননের কোলে পান্থী এক ডাকিছে’ এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘পান্থী’ (পুষ্পমালা) কিংবা ‘ফুল’ (পুষ্পমালা) তারই দৃষ্টান্ত। নবীনচন্দ্রের কবিতাগুলির নামকরণ থেকেই এর একটা ধারণা পাওয়া যায়—‘পিতৃহীন যুবক’ ‘পতিপ্রেমে হুঃখিনী কামিনী’ ‘কি লিখিব’ ‘জন্ম উচ্ছ্বাস’ ‘বান্দালীর বিষপান’ ‘আর্যদর্শন’ ‘বাই’। শিবনাথের

\* দ্রষ্টব্য শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধাবলী (১৯০৪); ‘কাব্য ও কবিতা’।

† কিন্তু এই প্যারডিতে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রটি হ'ন। তাঁর ধারণা হয়েছিল শিবনাথের এই কবিতা বিদ্যেপ্রণোদিত। দ্বিতীয় পর্ষায়ের বঙ্গদর্শন প্রকাশের সময় তিনি সুস্পষ্টভাবে কথা আদায় করে নেন, শিবনাথ শাস্ত্রীকে তাতে লিখতে দেওয়া হবে না।—নবীনচন্দ্র সেন ‘আমার জীবন’, দ্বিতীয় ভাগ (১৩১৬) পৃ. ৩৬১, ৩৬৮, ৩৭০।

খণ্ড কবিতার নামকরণেও এই নাটকীয়তার লক্ষণ আছে—‘হরিষে বিবাদ’ ‘গভীর নিশীথে’ ‘পরিত্যক্তা রমণী’ ‘বিধবার হরিণ’ ‘সত্যীচ পরাক্রম’ ‘বালবিধবার স্বপ্ন’ ‘হায় হায় কি হবে আমার’। খণ্ড কবিতায় এই ধরনের নাটকীয় পরিস্থিতি কল্পনার কারণ কি, তার একটা ইঙ্গিত ইতিপূর্বেই দেবার চেষ্টা করেছি। শিবনাথের পক্ষে সে কারণটা বিশেষভাবেই জোড়ালো। তিনি সারাজীবনই সমাজসেবামূলক নানা কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। যে আদর্শবাদিতা নিয়ে তিনি কাজে নেমেছিলেন, তাঁর কবিতার মধ্যে তারই ছায়াপাত হয়েছে। নারীজাতিকে নিয়ে লেখা তাঁর বহু কবিতাই আছে বিশেষ করে বিধবার দুঃখ এবং স্বামী পরিত্যক্তার দুঃখ নিয়ে লেখা কবিতার অভাব নেই। হেমচন্দ্রের নারীজাতি বিষয়ক কবিতাব সঙ্গে এই কবিতার একটা পার্থক্য করা যায়। জ্ঞানী বা অজ্ঞান প্রগতির উৎসাহ নিয়ে হেমচন্দ্রের কবিতা বচিত আর শিবনাথের কবিতা যেন অনেকটাই নারীর পারিবারিক জীবনের দুঃখ নিয়ে রচিত। এটাও মনে হয়, হেমচন্দ্রের কবিতায় মুখবতা বেশি, শিবনাথের কবিতায় গান্ধীর্ষ বেশি। খণ্ড কবিতাব বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র শিবনাথ একই শ্রেণীভুক্ত হলেও দৃষ্টিভঙ্গিগত স্বাতন্ত্র্য শিবনাথের এই যে, ব্যক্তিগত চারিত্র্যনীতিই তাঁর নৈতিক আদর্শের বিশেষত্ব। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের মধ্যে বৎ জাতিগত আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্দীপনার কথাই বেশি পাই।

শিবনাথের বড়ো দুটি কাব্য ‘হিমালয়কুসুম’ এবং ‘ছায়াময়ী পরিণয়’ থেকেই এর উদাহরণ দেওয়া যায়। হিমালয়কুসুম রচিত হয়েছিল কাসিমিয়াঙে। বইটিতে ছন্দ ভাষা এবং ছন্দোবন্ধের নৈপুণ্য দেখে লেখকের অক্ষুণ্ণ শক্তি সন্দেহ থাকে না। আট পংক্তির স্লোকে মিলেরও যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে। প্রথম ছয় পংক্তিতে দুটি মাত্র একান্তর মিল শেষ দুই পংক্তিতে একটি। নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধে দশ পংক্তির স্লোকে প্রথম আট পংক্তিতে চারটি একান্তর মিল, শেষ দুটিতে একটি মিল। ‘হিমালয়কুসুম’ পলাশীর যুদ্ধের মত আখ্যানমূলক এবং স্লোকবিশিষ্ট। ‘পলাশীর যুদ্ধ’ জাতীয় ভাবের উদ্দীপক রোমাঞ্চিককাব্য, ‘হিমালয়কুসুম’ ধর্ম এবং নীতিভাবের উদ্দীপক গাথাকাব্য। এই কাব্যে রোমাঞ্চিক কল্পনার যতখানি অবকাশ ছিল, বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা তা অনেকটাই খণ্ডিত হয়েছে। জীবী বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে নায়ক সংসার ত্যাগ করে যায়। তার সঙ্গে তার ভগিনীও যায়। তারা হিমালয়ের কোলে আশ্রয় নিল। হিমালয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ঈশ্বরের নামগান করে তারা দিন কাটায়। হঠাৎ অন্ধরের মধ্যে তারা বাহিববিশ্বের আহ্বান শুনে লোকালয়ে ফিরে এল; ফিরে এসে তারা সমাজসেবার ভার গ্রহণ করে। এইসময়ে সেই পতিত্যাগিনীও অল্পতপ্ত হয়ে ফিরে এল। এই কাহিনী-কল্পনার পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল, ভূমিকাতে শিবনাথ সে কথা বলেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের কয়েকটি ঘটনা থেকেই তিনি কাব্য রচনার প্রেরণা পান। ১৮৫৭-৫৮ সালে তিনি যখন হিমালয়শিখরে বাস করেন তখন একদিন একটা নিখরিগীর গতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হইল যে এই নিখরিগী যেমন জীবের কল্যাণসাধনের জন্ত নামিয়া যাইতেছে আমার শ্রীতিও কি সেইরূপ

নামিয়া যাইবে না ?... এই গ্রন্থে ভাই ভগিনীৰ প্রগাঢ় প্রীতি যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হয়ত এ দেশের পক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হইবে। ইহার আর একটি গুঢ় উদ্দেশ্য আছে, যাহা এখন প্রকাশ করা গেল না। এতদ্বারা সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইলে শ্রম সার্থকজ্ঞান করিব।” এই কাব্যে হিমালয়ের নিসর্গ-বর্ণনায় যে কবিশক্তি প্রকাশ পেয়েছে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের চেয়ে তা কোনো অংশেই হীন নয়। এই শক্তিকে অন্তর্নিবপেক্ষ করে তুলতে পারলে একটি সত্যিকার রোমান্টিক কাব্য রচিত হতে পারত। ব্যক্তিগত চারিত্র্যনীতির প্রভাবে তিনি আর একটি কাব্য লিখেছিলেন—‘ছায়াময়ী পরিণয়’। কোনও একটি ইংরেজি রূপক কাব্য পড়ে বাংলাতে আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ রূপক কাব্য রচনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে ‘ছায়াময়ী পরিণয়’ লেখেন। ঈশ্বরের জ্ঞান মানবাত্মার ব্যাকুল সাধনা ও কষ্টকৃত অভিজ্ঞতার কাহিনীই ছায়াময়ীর কাহিনী। এই রূপকের সঙ্গে স্বকী অথবা বৈষ্ণব রূপকের মিল আছে। কিন্তু ছায়াময়ী যে আধ্যাত্মসিদ্ধির পর আবার মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করল—এটা এ যুগেরই আদর্শ। শিবনাথের প্রথম কাব্য এবং শেষ কাব্যের মধ্যে তুলনা করলে স্পষ্টই দেখা যায় রূপক রীতিতেও কতখানি পরিবর্তন এসেছে। এখন রূপক আধ্যাত্মতত্ত্বকে পুরোপুরি আশ্রয় করেছে। ‘ছায়াময়ী পরিণয়’ স্ববৃত্ত ছন্দে লেখা একটি সম্পূর্ণ কাহিনী। কাহিনীর প্রতি অংশই প্রায় তত্বকে পরিস্ফুট করবার জ্ঞান সুপরিকল্পিত। রূপক হিসাবে যতই সার্থক হোক, কাব্য হিসাবে এতে যে কিছুটা কৃত্রিমতা এসেছে তা অস্বীকার করা যায় না। এই কাব্যের বিশেষত্বই হচ্ছে স্ববৃত্ত ছন্দেব একটানা ব্যবহার। ঈশ্বর গুপ্ত হেমচন্দ্র এই ছন্দের ব্যবহার কিছু কিছু করলেও শিবনাথই দীর্ঘ কাব্যে এর প্রয়োগ করলেন। ছন্দে ত্রুটি আছে, কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। শিবনাথের কাব্যপ্রয়াস ছন্দে ভাষায় ভাবে বিচিত্র। ঈশ্বর গুপ্ত রত্নলাল মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র—এঁদের সকলেরই কিছু কিছু প্রতিধ্বনি তাঁর কাব্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু যুগকে অতিক্রম করে যাঁদের প্রভাব বাংলা কাব্যে স্থায়ী হয়েছে, সেই বিহাবীলাল রবীন্দ্রনাথের ব্যঞ্জণীধর্মী ভাষা বা নব্যরীতির মাত্রা-বৃদ্ধির সাক্ষাৎ মেলে না তাঁর কাব্যে। নিন্দাই হোক প্রশংসাই হোক, শিবনাথ শাস্ত্রীর কাব্য-প্রয়াস সম্পর্কে এই কথাই বলা যায় যে, তিনি যুগকে ছাড়িয়ে যান নি। রবীন্দ্র-কাব্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কাব্যের মায়মান দীপ্তির সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর কাব্যও ম্লান হয়ে এল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবপ্রেরণাকে যারা জানতে চাইবেন অন্ত্যাত্ম কবিদের সঙ্গে শিবনাথের কবিতাও তাঁদের ন পড়লে চলবে না।

## শ্রীনিবাস-নরোত্তমের কালনির্ণয়

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুর উভয়েই উচ্চস্তরের কবি। উভয়েরই বহু শিষ্য কবিত্বাতি লাভ করিয়াছেন। শ্রীনিবাসের শিষ্যদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ ‘স্বরগদর্পণ’ ও কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন। অন্তান্ত শিষ্যের মধ্যে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাঙ্গীর, গোবিন্দ চক্রবর্তী, বংশী দাস, মোহন দাস, রাধাবল্লভ দাস, কবিরাজ, কর্ণপুর কবিরাজ, মুসিংহ কবিরাজ, গোবুল দাস (পদকল্পতরু ২২৭৫) ও গোপীরমণের (পদকল্পতরু ১৬০৮) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নরোত্তমের শিষ্যদের মধ্যে সর্বপ্রধান কবি হইতেছেন বসন্ত রায়।

নরোত্তমের আর একজন কবি-শিষ্য হইতেছেন বল্লভ, যিনি পদকল্পতরুর ১০২২ সংখ্যক পদের ভণিতায় লিখিতেছেন—

নরোত্তম দাস

আশ চরণে রহ

শ্রীবল্লভ মন ভোর।

তাঁহার অপূর্ণ এক শিষ্য উদ্ধব দাস, যাহার সম্বন্ধে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য অম্বা এক উদ্ধব লিখিয়াছেন।—“ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস” (পদকল্পতরু ৩০২২ পদ)। রাধামোহন ঠাকুরের পূর্ববর্তী নন্দকিশোর দাস, যিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার ‘রসকলিকা’ গ্রন্থে ঐ উদ্ধব দাসের দুইটি পদ (পৃ ১০৮-১০৯) উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদ দুইটি পদ কল্পতরুতে নাই। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সময় ঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারিলে তাঁহাদের কবি-শিষ্যদেরও কাল নিরূপণ করা সহজসাধ্য হইবে।

শ্রীনিবাস নরোত্তম অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। নরোত্তম তাঁহাকে গুরুর স্তায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তিনি তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজের ও শ্রীনিবাস আচার্যের তিরোধানে কাতর হইয়া লিখিয়াছেন—

আচার্য শ্রীশ্রীনিবাস

আছিহু যাহার দাস

কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।

তেঁহ মোরে ছাড়ি গেলা

রামচন্দ্র না আইলা

দুঃখে জিউ করে আনচান।

যে মোর মনের ব্যথা

কাহারে কহিব কথা

এ ছার জীবনে নাহি আশ।

অমঙ্গল বিষ খাই

মরিয়া নাহিক যাই

ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।

—নরোত্তমবিলাস, ১১শ বিলাসে উদ্ধৃত

হারাদেন দত্ত ভক্তিনিধি, অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি ও জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় কোন-প্রকার যুক্তিতর্ক না দেখাইয়া, কোন প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া আপ্তপুরুষের জ্ঞান বৈষ্ণব-কবিদের আবির্ভাব-তিরোত্তমের তাবিধ নির্দেশ করিবার রীতি প্রচলন করেন। তাঁহাদের সেই রীতি এখনও সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে বলিতে পারি না। ১৩৬২ সালের ফাল্গুন মাসে ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য যে ‘বলরাম দাসের পদাবলী’ প্রকাশ করেন, তাহাতে ‘পদাবলী কীর্তনের পরিচয়’ দিতে যাইয়া স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিয়াছেন (পৃ. ৩৭) যে, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের তিরোধান ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হয়। বোধ হয় যাহারা ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে খেতরীর মহোৎসব হইয়াছিল বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তিনি ঐরূপ লিখিয়াছেন। ১২৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ডাঃ স্কুয়ার সেন তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে লিখিয়াছেন (পৃ. ৪৩৫), “খেতরী-উৎসবের তারিখ জানা নাই। অনেকে মনে করেন ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ। এ তারিখের সমর্থনে কোন তথ্য নাই, প্রবল যুক্তিও নাই। আরও বিশ-পঁচিশ বছর পরে হওয়া সম্ভব।” খেতরীর উৎসব নরোত্তম ঠাকুরের ও আত্মজন্মিকভাবে শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনের তথা গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাসের একটি ভূমিকা। ডাঃ স্কুয়ার সেন খুব সম্ভব ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের মত অনুসরণ করিয়া খেতরী উৎসবের তারিখ ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দের বিশ-পঁচিশ বৎসর পরে বলিয়াছেন।

ডাঃ নাথ ঐচ্ছৈচ্ছচরিতামৃতের ভূমিকায় (১৩৩০ সংস্করণ পৃ. ৩৯৮ হইতে ৪১৮ পর্যন্ত) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীনিবাসের জন্ম ১৫৭২ হইতে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে; বৃন্দাবন গমন ১৫৯২—১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং খেতরীর মহোৎসব ১৬০১-১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাধামাধব তর্কতীর্থ মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে “শ্রীনিবাস আচার্যের জন্মকাল হিসাবে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ বা নিকটবর্তীকালের গ্রহণই যুক্তিযুক্ত মনে হয়” (*Our Heritage*, দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম ভাগ, ১২৫৪ জাহ্নবীরী—জুন সংখ্যা, পৃ. ১২৭—১২৮)। নাথ মহাশয় ও তর্কতীর্থ মহাশয় প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, অন্নবাগবলী, ভক্তিবন্ধুর ও নরোত্তমবিলাসের কোন কোন উক্তির প্রামাণিকতা বিচার করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় আপ্তবাক্য হিসাবে বলিয়াছিলেন যে ১৪৬৫-৬৬ শকে অর্থাৎ ১৫৪৩ কি ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাসের জন্ম হয় (গৌরপদ তরঙ্গিণীর ভূমিকা, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৭০)। ইহার কেহই শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ শিষ্য কর্ণপুর কবিরাজের লিখিত শ্রীনিবাসের গুণলেশচক্রে ২১টি শ্লোক দেখেন নাই।

১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাতরতীর নবীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁহার “প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম” নামক মূল্যবান গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে শ্রীনিবাস ১৫১২২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন (পৃ. ১৮২), ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করেন এবং ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। তাঁহার বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ তিন ভক্তি-

স্বাক্ষর করে উদ্ধৃত শ্রীনিবাসের শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজের নবপণ্ডের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহাতে বলা হইয়াছে যে শ্রীপুরুষোত্তমধামে গমন করিতে ইচ্ছুক শ্রীনিবাস। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানবার্ষিকী লোকমুখে স্তুতিয়া অতি দূঃখে পুনঃ পুনঃ মুচ্ছাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। স্বপ্নময়বাবুর সিদ্ধান্ত এই—“নৃসিংহ কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য। অতএব শ্রীনিবাসের জীবনকাহিনী সম্বন্ধে তাঁর কথা সম্পূর্ণ প্রামাণ্য। তিনি যখন বলেছিলেন যে শ্রীনিবাস আচার্য্য চৈতন্যদেবের জীবৎকালে জন্মেছিলেন এবং নীলাচল যাবার পথে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব-সংবাদ শুনেছিলেন, তখন আর এ বিষয়ে কোন কথা উঠতেই পারে না।” (পৃ. ১২২)

স্বপ্নময়বাবু যদি নরহরি চক্রবর্তীর নবোত্তমবিলাস দেখিতেন তাহা হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্যের অপর একজন শিষ্য, কর্ণপুর কবিরাজের ‘শ্রীনিবাসাচার্য্যগুণলেশসূচক হইতে উদ্ধৃত আর দুইটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে তাঁহার মত দৃঢ়ীকৃত করিতে পারিতেন। শ্লোক দুইটির দ্বিতীয়টি এই—

গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং পথিঃ শ্রুতশ্চৈতন্য সঙ্কোপনং  
মুচ্ছাভূয় কচান্ লুনন্ অশিরসো ঘাতং দধদ্বিকৃতঃ\* ।  
তৎপাদঃ\* হৃদি সন্নিধায় গতবামীলাচলং যঃ স্বয়ং  
সোহয়ং মে করুণানিধি বিজয়তে শ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ।

—নবোত্তমবিলাস, দ্বিতীয় বিলাস, পৃ. ৮৩

নরহরি চক্রবর্তী খুব সম্ভব ভক্তিরসাকর লিখিবার সময় কর্ণপুর কবিরাজের লিখিত সূচকটি পান নাই, তাই, ঐ গ্রন্থে উহা ব উল্লেখ করেন নাই। উহার এক খণ্ড বরাহনগর পাঠ-বাড়ীর মন্দিরে আছে। হরিদাসদাস বাবাজী মহোদয় উহার আর-এক খণ্ড পুথি শ্রীনিবাসবনের নন্দকিশোর গোস্বামীর নিকট হইতে পাইয়া উহা শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থমালায় প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে (পৃ. ২৫) পূর্বে উদ্ধৃত শ্লোকটির নিম্নলিখিত পাঠান্তর দেখা যায়—

(১) শ্রুতশ্চৈতন্য সঙ্কোপনং (২) ধুনন্ (৩) দদদ্বিকৃতম্ (৪) তৎপদং  
(৫) শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ

কর্ণপুর কবিরাজকৃত সূচকটির প্রামাণিকতা প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক। প্রেমবিলাসের কলেবর কি কবিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা আমি শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদানে (দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ. ৪৭৭—৪৮৫) দেখাইয়াছি। উহার চতুর্বিংশ বিলাসে (পৃ. ৩০১) আছে, ১৫২২ শকের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ঐ তারিখ স্বার্থ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রেমবিলাসে এত উক্তি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে যে ইহার কোন কথার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আশ্বিন তারিখে বিনোয়ী পত্রিকায় (পৃ. ৩৮৯) হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “আমার বাড়ীতে দুই শত বৎসরের অধিককালের হস্তলিপি যে একখানি প্রেমবিলাস গ্রন্থ আছে, তাহার সহিত মুদ্রিত পুস্তকের অনেক স্থলে প্রসঙ্গের মিল নাই।...কেবল

বর্তমান কালে বলিয়া নহে, প্রাচীনকাল হইতেই এই প্রেমবিলাসের নানা স্থানে নানা জনের কারিগিরি আছে। অতএব এই গ্রন্থ বিশেষ তলাইয়া পাঠ করা উচিত।” কর্ণানন্দ গ্রন্থ-খানি শ্রীনিবাস আচার্যের কত্কা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যদুনন্দন দাসের (বৈষ্ণব) রচনা। মুদ্রিত কর্ণানন্দ গ্রন্থের ষষ্ঠ মঞ্জরীতে আছে—

বুধাই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে ।

সদাই আনন্দে ভাসি জাহবীর তটে ॥

পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে ।

বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে ॥

নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া ।

সম্পূর্ণ কবিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥

ইহার পর আবার সপ্তম মঞ্জরী মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া যায়, উহা নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত। যাহা হউক এই তারিখ যথার্থ হইলে গ্রন্থ রচনার কাল ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ হয়। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদে ৩৬২ সংখ্যক পুথিতে তারিখযুক্ত পয়ারটী নাই, যদিও ইহার অব্যবহিত পূর্বের ও পরের পয়ার আছে। ঐ পুথিখানির বয়স কিন্তু এক শত বৎসরের চেয়ে বেশী প্রাচীন নহে। কর্ণানন্দ প্রকৃতপক্ষে শ্রীনিবাসের শাখা বর্ণনার গ্রন্থ। উহার অতিবিস্তৃত যে ঘটনা ইহাতে লিখিত হইয়াছে তাহার প্রামাণিকতা কতদূর বলা যায় না। উহাতে লিখিত আছে যে কর্ণপুর কবিরাজ শ্রীনিবাসের শাখা বর্ণনা কবিগোবিন্দ (পৃ. ৪)। ইহাতে প্রেমবিলাসের প্রমাণও উল্লেখ করা হইয়াছে—

যে প্রকাষে গৌড়দেশে গমন করিলা ।

প্রেমবিলাস গ্রন্থ মাঝে বিস্তরি বর্ণিলা ॥

লিখিলেন সেই গ্রন্থ জাহ্নবা আদেশে ।

গ্রন্থ প্রকাশিলা তাহা নিত্যানন্দ দাসে ॥ (পৃ. ১১৬)

কিন্তু ষষ্ঠ মঞ্জরীতে গ্রন্থসমাপ্তির কথা লিখিবার পর যে সপ্তম মঞ্জরী যোগ করা হইয়াছে তাহাতে প্রেমবিলাসের বিরোধী কথা পাওয়া যায়। প্রেমবিলাসে (বিষ্ণুপুরের রাণীর পুথির দ্বাদশ বিলাস ও যশোদানন্দন তালুকদারের সংস্করণের ত্রয়োদশ বিলাসের ২৪ পৃ.) আছে যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, যাহা শ্রীনিবাসের সঙ্গে বন্দাবন হইতে গোড়ে পাঠানো হইয়াছিল তাহা চুরি গিয়াছে খবর পাইয়া কবিরাজ গোস্বামী—

কুণ্ডতটে বসি সদা কবে অহুতাপ

উছলি পড়িল যাই দিয়া বড় ঝাঁপ ॥

—সাহিত্য-পরিষদ পুথি, ২৬২ সংখ্যা

ছাপা গ্রন্থের পাঠ—

কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অহুতাপ ।

উছলি পড়িল গোস্বামি দিয়া এক ঝাঁপ ॥

তারপর “মুদিত নয়নে গ্রাণ কৈল নিষ্কামণ” (পৃ. ২৪)। কর্ণানন্দে আছে যে, তিনি রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন বটে, কিন্তু তখনই তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের আদেশ পাইয়া তিনি গ্রন্থ পাইবার আশায় আর কিছুদিন জীবিত ছিলেন। উভয় গ্রন্থের বিবরণই সম্পূর্ণ অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বায় গ্রন্থের কি কেহ কোন অঙ্কলিপি বৃন্দাবনে বাখেন নাই? কোন অঙ্কলিপি করিবার পূর্বেই কি মূলগ্রন্থখানি শ্রীনিবাসের সঙ্গে পাঠানো হইয়াছিল? যদিই বা তাহা হইয়া থাকে, কবিরাজ গোস্বামীর মতন সিদ্ধপুরুষ কি গ্রন্থ নষ্ট হওয়ার জন্য আত্মহত্যা করিতে পারেন? বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কি রাধাকুণ্ডে বা বৃন্দাবনে সেই খবর পৌঁছিয়াছিল? গ্রন্থ চুরির কয়েকদিনের মধ্যেই তো শ্রীনিবাস সেগুলি ফেরত পান বলিয়া কিম্বদন্তী। অল্পবয়সীতে গ্রন্থ চুরি যাইবাব কোন কথাই নাই; আর ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে গ্রন্থ চুরির কথা থাকিলেও কবিরাজ গোস্বামীর রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিবার কোন প্রসঙ্গ নাই।

সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে এই যে বৃন্দাবন হইতে কাটোয়ার নিকটবর্তী ষাঁজগ্রামে বা দাঁইহাটের নিকটে চাকুন্দী ষাইবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি কেন ষাইবেন? প্রেমবিলাসে আছে—শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে জিটানগর (বোধ হয় এটোয়া) পর্য্যন্ত ষাইয়া—

ঝাড়িগুণ্ড পথে যাব করিলা নির্বন্ধ ।

মগদেশ বামে করি পথে চলি যায়

...

ঝাড়দেশ ছাড়াইলা উত্তরিল গিয়া ।

তমলুকে যান মনে আনন্দ পাইয়া ॥

—ত্রয়োদশ বিলাস পৃ. ২১

শ্রীনিবাসকে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার কাছাকাছি ষাইতে হইবে। তিনি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বৃন্দাবন হইতে মগদেশ, বোধ হয় মগধ দেশ, বামে রাখিয়া ছোটনাগপুরের ভিতর দিয়া সোজা দক্ষিণে তমলুক চলিয়া ষাইবেন কেন? আবার তমলুক হইতে ফের “পঞ্চবটী বামে রাখি রঘুনাথপুরে” (পৃ. ২২) (পুরুলিয়ার নিকটবর্তী) ষাইয়া বিষ্ণুপুরের নিকটে আসিবেন কেন? ভৌগোলিক তথ্য এই বিবরণের বিরুদ্ধে। এইরূপ ভাবে কাহারও উদ্দেশ্যহীন চলাফেরা করার বিবরণ অবিশ্বাস্য।

কর্ণপুর কবিরাজের লিখিত সূচকে বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থ আনিবার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতেও গ্রন্থ চুরির কোন কথা নাই। উহাতে আছে শ্রীনিবাস পুনরায় নরোত্তমকে লইয়া শ্রীজীবের কুঞ্জে ষাইলেন এবং স্বয়ং চারি ভার গ্রন্থ লইয়া তিনি গোড়ের দিকে যাত্রা করিলে শ্রীজীব শত বৈষ্ণবেব সহিত এক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাঁহার অঙ্গগমন করিলেন (৫২ শ্লোক)। প্রেমবিলাসে আছে যে, শ্রীজীব ‘সিদ্ধক সজ্জা কবি পুস্তক ভরেন বিরলে’; তার পর—

সর্বলোকের সাক্ষাতে ক্লুপ দিল তায় ।

মোমজামায় ঘেরাইল সর্বাঙ্গে লেপটায় ।

ঐ সিদ্ধুক বলদের গাড়ীতে চড়ানো হইল এবং ‘দশজন অজ্ঞধারী হিন্দু সঙ্গে যায়’ ( পৃ. ২১ ) । অর্থাৎ বড়লোকে ধনসম্পত্তি লইয়া যাইবার সময় যে যে আয়োজন করিতেন, নিকিঞ্চন বৈষ্ণবের গ্রন্থাদি লইবার সময়ও সেইরূপ আয়োজন করা হইল— যাহাতে ডাকাতে মনে করিতে পারে যে ইহাতে ধনসম্পত্তি যাইতেছে । নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরসাকরে কর্ণপুরের বিবরণের ‘ভারচতুষ্টয়’ শব্দটি লইয়াছেন—

গোস্বামীহ দেখি গ্রন্থ ভার-চতুষ্টয় ।

রাখে কাষ্ঠ-সম্পূটে নিবারি বর্ষা ভয় ॥

—যষ্ঠ তরঙ্গ, পৃ. ৪৭০

কর্ণপুর কবিরাজের স্মৃচকে দেখা যাইতেছে যে নরোত্তমঠাকুর শ্রীনিবাসের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে গোড়ে যান নাই—

তানু নীত্বা ধনু বৈষ্ণবানতিশুচ’ দৃষ্ট্য মহত্যা পুরো

দৃষ্ট্য। যং কিল জীবীকুরবরো বৃন্দাবনেহসৌ গতঃ ।

এবৈষ্ণব নরোত্তমো হরিরিতি স্মৃত্বা ব্রজং প্রাপ্তবান ॥

‘তখন শ্রীজীবীকুর শ্রেষ্ঠ বড় সহর অর্থাৎ মথুরা হইতে বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীনিবাসের প্রতি মহাশোক সহকৃত ( অথবা স্মৃতি কবিতা ) দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে ফিরিলেন এবং নরোত্তমও হরি স্মরণ করিয়া ব্রজে চলিলেন ।’ ( ৬০ )

শ্রীনিবাস আচার্য্যও বারংবার শ্রীজীবগোস্বামীর চরণে পড়িয়া তথা হইতে অতিক্রান্ত গতিতে চলিলেন এবং অদূরে যাইতে না যাইতেই আবার ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন । তার পর তাঁহাদের কথাগুলি স্মরণ করিতে করিতে গোড় দেশের দিকে শ্রীজ গমন করিলেন ( ৬৪ ) । ব্রজগিরির গহ্বর হইতে গ্রন্থমেঘ আনিয়া গোড়ভূমিতে যিনি সানন্দে কৃষ্ণ-প্রেমরূপ বর্ণণে কলিরূপ সূর্য্যতাপে দগ্ধ জীবরূপ শাস্ত্রসমূহকে সিঞ্চনপূর্ব্বক পুনরায় সজীব এবং প্রেমভক্তির বাদল করিয়াছেন এবং নিজেও আনন্দিত হইয়াছেন, সেই শ্রীনিবাস প্রভুর জয় হউক ( ৬৫ ) । যাজ্ঞিগ্রামে প্রবেশ করিয়া ইনি প্রীতিভরে বাস করিতে লাগিলেন ; তাঁহার দর্শনলাভের আশায় প্রত্যহ শত শত বৈষ্ণব আসিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের সহিত প্রেম-সম্ভাষণপূর্ব্বক ইনি যত্ন সহকারে গোস্বামি-গ্রন্থসমূহ শ্রবণ করাইতেন ( ৬৬ ) । সকলের অহুরোধে ইনি দারপরিগ্রহ করিলেন ; ভক্তিগ্রন্থের ব্যবসায়, হরিনাম গ্রহণ ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দর্শনের আশায় ইনি প্রতিদিন রাধেকৃষ্ণ এই নাম গ্রহণ করিয়া কাল কাটাইতেন ( ৬৭ ) ।

কর্ণপুর কবিরাজের এই বিবরণ অহুরাগবল্লীর বর্ণনার দ্বারা সমর্থিত হয় । অহুরাগবল্লী ১৬১৮ শকে বা ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্রমাসের শুক্লাদশমী তিথিতে বৃন্দাবনধামে মনোহর দাস

কর্তৃক লিখিত হয়। শ্রীনিবাসের শিষ্য রামচরণ চক্রবর্তী, তাঁহার শিষ্য রামশরণ চট্টরাজ এবং চট্টরাজের শিষ্য এই মনোহর দাস। সুতরাং শ্রীনিবাসের সঙ্গে ইহার দুই পুরুষের মাত্র ব্যবধান। ইহার বাড়ীও ছিল শ্রীনিবাসের বাড়ীর কাছে, কাটোয়ার নিকটে বাগণ্যকোলা বা বেগুণকোলায়। নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে অন্নুরাগবল্লী গ্রন্থের প্রামাণিকতার উল্লেখ করিয়াছেন (ত্রয়োদশ তরঙ্গ, পৃ ১০১৮)। অন্নুরাগবল্লীর মতে শ্রীজীব তাঁহার অন্নুগত এক মহাজনকে বলিলেন—

যবে মহাজনের গাড়ি আগরা চলিতে ।  
তাহারে শ্রীজীব গোসাঞি কহিলা নিম্ভতে ॥  
আচার্য্য মহাশয়ের হয় পুস্তকাদি যত ।  
সামগ্রী লইয়া তুমি চলহ ঘরিত ॥  
সেখানে আপন ঘরে ইহাকে রাখিয়া ।  
গাড়িতে যে ভাড়া লাগে তাহা তাঁরে দিয়া ॥  
ইহাকে পথের যেবা ধরচ চাহিয়ে ।  
সভে মিলি দিহ যেন আমি স্মৃখ পাইয়ে ॥

—ষষ্ঠ মঙ্গরী, পৃ. ৩৬

এই কথা অন্নুসারে সেই মহাজন শ্রীনিবাসকে আগরা পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। তার পর—

সেখানে সর্ব মহাজন একত্র হইয়া ।  
গাড়ি ভাড়া করি দিল বিনয় করিয়া ॥  
অনেক পুস্তক সঙ্গে সামগ্রী না চলে ।  
এতক বুঝিয়া ছায়া সমাধান কৈলে ॥  
যাবার ধরচপত্র যতক লাগয়ে ।  
বস্ত্র পাত্র সঙ্গে মাত্র যে কিছু চাহিয়ে ॥  
সকল দিলেন পাছে বাজ-পত্নী ধরি ।  
আপন আপন সীমা সভে পার করি ॥  
এই মত ক্রমে ক্রমে আইলা গোড়দেশ ।  
স্বত্ররূপে কহি কিছু তাহার বিশেষ ॥

—পৃ. ৩৭

ইহার মধ্যে সিন্ধুকে গ্রন্থ রাখিয়া উহাতে মোমজামা পরাইবার কথা নাই, সৈন্তসামন্ত, লোক-লক্ষ্যের কথা নাই, এবং তাহার ফলস্বরূপ চুরির কথাও নাই। এই বর্ণনা খুবই স্বাভাবিক।

তাহা হইলে গ্রন্থ চুরির কথা কি মিথ্যা? না, তাহা নহে। গ্রন্থ চুরি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা বৃন্দাবন হইতে যাজ্ঞিগ্রাম আসিবার পথে নহে। পরবর্তী কোন-এক সময়ে গোড়দেশ হইতে পুরীধামে কিছু গ্রন্থ লইয়া যাইবার কালে। কর্ণপুর কবিরাজ বলেন—

‘বনপথে পুরুষোত্তম ষাণ্ময়ার সময় গ্রন্থ চুরি হইয়া গেলে, তিনি সেখানকার রাজসভায়

গিয়া ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীমদভাগবতীয় ভ্রমর (বটপদ) গীতের পাঠশ্রবণে অতিশয় হান্ত (বিক্রপে) করিয়াছিলেন (৮৭ শ্লোক)।

এই উক্তির প্রতিনিধি কর্ণানন্দে ও ভক্তিরসাকরে আছে। কিন্তু ভক্তিরসাকরে প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে আসিবার সময়কার ঘটনার সহিত এই ঘটনাকে জুলাইয়া ফেলা হইয়াছে। যথা—

শ্রীনিবাসাচার্য্য লৈয়া গ্রন্থ বহুগণ ।  
চলে গোড়পথে করি গৌরানন্দ স্মরণ ॥  
সঙ্গে নরোত্তম আছে দেহ ভিন্ন মাত্র ।  
শ্রামানন্দ আচার্য্যের অতি স্নেহ পাত্র ॥  
নরোত্তম শ্রামানন্দ সহ শ্রীনিবাস ।  
নির্বিলম্বে চলয়ে পথে হইয়া উল্লাস ॥  
নীলাচলে যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া ।  
সে সভার সঙ্গে চলে বনপথ দিয়া ॥

সর্বত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন ।  
নীলাচলে যায় সঙ্গে লৈয়া বহু ধন ॥  
রাজা বীর হাঙ্গীরের দক্ষ্যগণ যত্নে ।  
গনিয়া দেখিল গাড়ী পূর্ণ নানা রত্নে ॥

—ভক্তিরসাকর, সপ্তম তরঙ্গ, পৃ. ৪৮৮-৮৯

অনুরাগবল্লীতে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে যে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় শ্রামানন্দকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন এবং সেই সময় বীর হাঙ্গীর শিষ্য হইয়াছিলেন। যথা—

শ্রীজীব গোসাঞি নিকটে শ্রীশ্রামানন্দ গোসাঞি ছিল ।  
তাঁরে আচার্য্য ঠাকুর সঙ্গে করি দিলা ॥  
এবং ব্যাস আচার্য্য ঠাকুর দুই জন লইয়া ।  
গোড়দেশ আইলা কবিরাজ সঙ্গে করিয়া ॥  
পূর্ববৎ ভক্তিশাস্ত্র কৈল প্রবর্তন ।  
বীর হাঙ্গীর আদি শিষ্য হৈল বহুজন ॥

—পৃ. ৪০-৪১

[ ক্রমশঃ ]

## স্বরলিপি

ভৈরবী—জলদ তেতালা

কমলবদনি লো চঞ্চল যুগবৎ এত অধৈর্য কেন  
এই বোধ হয় মোর হতেছ যে অস্থির—  
সাদৃশ্যের গুণ বুঝি তব যুগ নয়ন।  
রাত্রিদিন যারে ভাব সেজন নিতান্ত তব  
বুধায় সন্দেহ কবি কাতর হও হৃদয়  
তোমার এ রূপ হেরি মুহুঁত মম মন।

—রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)

“গীতরত্ন” গ্রন্থ অমুসারে এই গানটির স্বর শ্রামপূরবী এবং তাল হরি। “নিধুবাবুর  
গীতাবলী”তেও এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। “বাদ্যালীর গান” অমুসারে ইহার স্বর ভৈরবী  
এবং তাল জলদ তেতালা। আমরা এই গানটি ভৈরবী—জলদ তেতালায় পাইয়াছি।

স্বর সংগ্রহ— শ্রীকালীপদ পাঠক

স্বরলিপি— শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

II দা পা মজা মা । পা দা পা -। -। -। -। -। -। -। -। -। I  
ক ম লং ব দ নী লোং . . . . .

পা -। দা সু। পা গদপা মা -। । জা সজা -মপা মা । জবা মজা স্বা সা I  
চ ন্ চ ল য় গং ব ৭ এ তং . . . অ ধৈর্য য কেন

সা সা গ্ দা -গ্। সা -জা রা -জা। সা জা সজপা মা । জবা -জা স্বা সা I  
এ ই বোং ধ্ হ য়্ মো র্ হ তে ছং য়ে অং . . স্থির  
মা মা মা জা । মদা -গর্দা গা গা । গা সর্গজর্দা স্বা গা । গা গা গদা -পা II  
সা দৃ শ্চে র গুং . ৭ ব্ বু খি ত বং . . যু গ ন য় নং .

II মা মা মদা -গর্দা । গা গা স্বা গা । গা সর্গজর্দা স্বা গা । গা সর্গর্দা গদা পা I  
বা ত্রি দিং . ৭ য়া রে ভা ব সে জং . . ন নি তান্ তং . . তং ব  
গর্দা গা গদা -মা । জা জমা -দগা -গর্দা । গা সর্গর্দা -গর্দা গদা । -দা -গা -। -। I  
রাং . ত্রি দিং ন্ য়া রে . . . . . ভাবং . . . . .  
গা সর্গজর্দা স্বা -গা । -। -। গা গা । গর্দা -গা -স্বা -গর্দা । -গা দা পা -। I  
সে জং . . ন . . . . . নি তান্ তং . . . . . ত ব .  
পা পা পা পা । পা পা দা পা । পা পা পা পা । গদা -পদা পা মা I  
বু ধা ই সন্ দে হ ক বি কা ত র হও হৃ . ৭ দ রী  
মা মা মা জা । মদগর্দা গা গা । সর্গর্দা -জর্দা স্বা গা । -। গা গা গা I  
তো মা র এ রূ পং . . হেরি ছং কৃষি ত . . ম ম ম  
গর্দা -স্বজর্দা স্বা গা -গর্দা । -স্বর্দা -গদা -পমা -জমা । -পদা -পমা -জমা -জবা । -সা -। -। II II  
নং . . . . .

## সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৬৬ ॥ সংখ্যা ২

### সূচীপত্র

|                                     |                              |     |
|-------------------------------------|------------------------------|-----|
| অথর্ববেদের পৈপ্ললাদ শাখা            | শ্রীহর্গামোহন ভট্টাচার্য     | ৫১  |
| অক্ষয়কুমার বড়াল শতবার্ষিকী        |                              |     |
| কবি অক্ষয়কুমার বড়াল               | শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা          | ৬২  |
| বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভা         | শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ৭৮  |
| হিন্দী ভাষার কথা                    | শ্রীবিষ্ণুশঙ্কর ভট্টাচার্য   | ৭৯  |
| কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্কের রচয়িতা ? | শ্রীঅক্ষয়কুমার কায়াল       | ৯৪  |
| শ্রীনিবাস-নরোত্তমের কালনির্ণয়      | শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার      | ৯৮  |
| শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব বিষয়ে         |                              |     |
| বাস্তব ঘোষের পদ                     | শ্রীমালবিকা চাকী             | ১১৫ |
| সরলা দেবী চৌধুরাণীর রচনাপঞ্জী       | শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল         | ১২০ |
| গান । স্বরলিপি                      | অক্ষয়কুমার বড়াল ।          | ১২৮ |
|                                     | সরলা দেবী চৌধুরাণী           |     |

### চিত্রসূচী

|                   |    |
|-------------------|----|
| অক্ষয়কুমার বড়াল | ৫১ |
|-------------------|----|

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা । বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা ।

পরিষদের সমস্ত-পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য ।

## সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সাহিত্যিকদের জীবনী ও রচনাবলীর পরিচয়। ১ম—২য় খণ্ড একত্রে মূল্য—৫৫/-  
পৃথক্ ভাবে ২৭খানা বই এবং খুচরা খণ্ডও পাওয়া যায়।

শ্রীসঙ্কীকান্ত দাস-সম্পাদিত

নবীনচন্দ্র-রচনাবলী

১ম—৩য় খণ্ড ( আমার জীবন )—৩২/-

সম্প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড—১০/-

অগ্রান্ত খণ্ড ( যন্ত্রস্থ )

হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

সমগ্র রচনাবলী দুই খণ্ডে স্বেচ্ছা রেক্সিনে  
বাঁধাই। মূল্য—২০/-

অক্ষয়কুমার বড়াল-

গ্রন্থাবলী

স্বদেশ রেক্সিনে বাঁধাই। মূল্য—১৫/-

রামেন্দ্র-রচনাবলী

৬ষ্ঠ খণ্ড ( বিবিধ ) মূল্য—১০/-

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসঙ্কীকান্ত দাস-সম্পাদিত

বঙ্কিম-রচনাবলী

উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা আট খণ্ডে  
স্বদেশ রেক্সিনে বাঁধাই। মূল্য—৭৫/-

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

কাব্য, নাটক, প্রহসনাদি বিবিধ রচনা  
স্বদেশ রেক্সিনে বাঁধাই। মূল্য—২০/-

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, রসমঞ্জরী ও বিবিধ কবিতা  
স্বদেশ রেক্সিনে বাঁধাই। মূল্য—১০/-  
কাগজ মলাট—৮/-

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী

নাটক, প্রহসন, গল্প-পঞ্চ দুই খণ্ডে স্বদেশ  
রেক্সিনে বাঁধাই। মূল্য—২০/-

দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী

কবিতা, গান, হাসির গান। মূল্য—১২ ৫০

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

সমগ্র বাংলা রচনাবলী স্বদেশ রেক্সিনে  
বাঁধাই। মূল্য—১৭ ৫০

বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী

বলেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী।—১৫/-

রামেন্দ্র-রচনাবলী

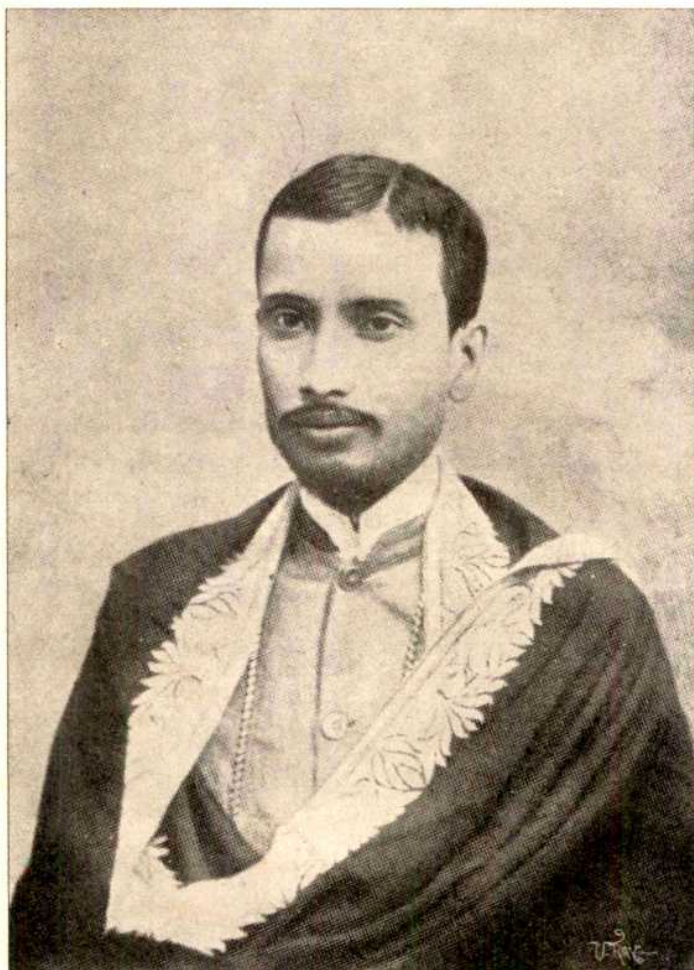
১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড একত্রে মূল্য—৬০/-

শরৎকুমারী চৌধুরানীর  
রচনাবলী

‘সুভবিবাহ’ ও অগ্রান্ত সমাজ চিত্র।  
মূল্য—৬ ৫০

পাঁচকড়ি-রচনাবলী

১ম+২য় খণ্ড একত্রে মূল্য—১২/-



অক্ষয়কুমার বড়াল

জন্ম ১৮৬০

মৃত্যু ১৯১৯

## অথর্ববেদের পৈশ্বলাদ শাখা

শ্রীভূগামোহন ভট্টাচার্য

### পূর্বভারতে বেদের প্রসার

পুরাতত্ত্বের পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ভারতবর্ষের পূর্ব অঞ্চল—অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশ স্বদীর্ঘকাল বৈদিক সভ্যতার গণ্ডীর বহির্ভূত ছিল। বৈদিক সাহিত্যে পঞ্চনদ ও সম্মিহিত প্রদেশের অধিবাসী গন্ধার, কেকয় ও মজ্জভাতির এবং মধ্যদেশীয় কুরুপঞ্চালগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এক সময়ে তাঁহাদের মধ্যেই বেদের প্রভাব নিবদ্ধ ছিল—ইহাই হইল সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রধান যুক্তি। সে যাহাই হউক, মহাভারতের বর্ণনায় (কর্ণ ৪৮।১৪, ১৫) কুরুপঞ্চালদিগের সঙ্গে পূর্বদেশীয় পুণ্ড্র ও কলিঙ্গের অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ উড়িষ্যার অধিবাসীরাও শাস্ত্রত ধর্মে অভিজ্ঞ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।—

কুরবঃ সহপঞ্চালাঃ সার্বা মন্ত্রাঃ সনৈমিষাঃ ।

কোশলাঃ কাশপৌণ্ড্রাশ্চ কলিঙ্গা মগধাস্তথা ।

চৈদয়শ্চ মহাভাগা ধর্মজ্ঞানন্তি শাস্ত্রতম্ ।

বিষ্ণুপুরাণের (২।৩।১৫, ২০) উক্তি অনুসারে কামরূপ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ প্রভৃতি পূর্বদেশে মুনিরা তপশ্চরণ করিতেন, যাজ্ঞিকেরা হোমার্চুষ্ঠান করিতেন।—

পূর্বদেশাদিকার্শ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ ।

পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্বশঃ ।

তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজিনঃ ।

অতি প্রাচীন কালেই যে অঙ্গ প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের গ্রামে গ্রামে বৈদিক সংস্কৃতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে প্রশংসার অভাব নাই। পতঞ্জলির পাণিনীয় মহাভাষ্যের উদাহরণে (৬।২।১) অঙ্গদেশের পূর্বদিকে ব্রাহ্মণবসতির উল্লেখ আছে।—

লোকেশ্বর আজ্ঞাপয়তি—প্রাগঙ্গং গ্রামেভ্যো ব্রাহ্মণা

অনৌয়ন্তামিতি ।

পরবর্তী কালে যে পূর্বাঞ্চলে বেদবিজ্ঞার বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল সে কথা এখন সম্পূর্ণ প্রশংসনীয়। তাহা ছাড়া সম্প্রতি যে সকল প্রাচীন পুঁথি ও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে,

১. প্রাক্সায়ণিক বেদভাষ্যকার বাদ্দালী গুণবিষ্ণু ও হল্যায়ুষের গ্রন্থ এ বিষয়ে জীবন্ত প্রমাণ। গুণবিষ্ণুকৃত ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ-গ্রন্থমালা ১৯৩০),

তাহাতে মনে হয় যে, অথর্ববেদের পৈপ্ললাদ শাখা ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তেই সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাত্ত।

### অথর্ববেদের শাখাভেদ

পুরাণাদি গ্রন্থে অথর্ববেদের নয়টি শাখার নাম পাওয়া যায়—পৈপ্ললাদ, তৌদ, মৌদ, শৌনক, জাজল, জলদ, ব্রহ্মবদ, বেদদর্শ এবং চারণবৈভ।<sup>১</sup> মুখ্যতঃ শাখাপ্রবর্তক ঋষিদের নাম অনুসারেই এই বেদসম্প্রদায়গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মন্ত্রসংহিতা ও কল্পসূত্রের মধ্যে নানারূপ পাঠভেদ ও প্রয়োগভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। অথর্ববেদের অধিকাংশ সংহিতা ও সূত্র আজ বিলুপ্ত। নানা গ্রন্থের বিভিন্ন উক্তি ও উদ্ধৃতি উহাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয় মাত্র।<sup>২</sup>

### কাশ্মীরে স্থাপিত পৈপ্ললাদ পুথির আবিষ্কার

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান অধ্যাপক রুডল্ফ রোই (Roth) এবং মার্কিন অধ্যাপক ডব্লিউ. ডি. হুইটনি (Whitney), বার্লিন নগরে শৌনকশাখার অথর্ববেদসংহিতা প্রথম প্রকাশ করেন। পরে এই সংহিতার বিভিন্ন সংস্করণ ও প্রাচীন ভাষা ছাপা হইয়াছে এবং নানা ভাষায় অনুবাদ বাহির হইয়াছে।

কিন্তু শৌনকসংহিতা সম্পাদন করিয়া বিচক্ষণ পণ্ডিত রোই সাহেবের তৃপ্তি হইল না। তিনি অথর্ববেদের অপর কোন শাখার একখানি উৎকৃষ্ট মন্ত্রসংহিতার সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেরণায় এবং ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টায় ১৮৭৩ সালে কাশ্মীরে পৈপ্ললাদসংহিতার একখানা জীর্ণ ও খাণ্ডত পুথি আবিষ্কৃত হইল। ভূর্জপত্রের উপর কাশ্মীরীয় শারদা লিপিতে লেখা এই পুথিখানা তদানীন্তন ভারত সরকারের আত্মকূল্যে বার্লিনে রোই সাহেবের নিকট চলিয়া গেল। সাফল্যতৃপ্ত রোই পুথিপ্রাপ্তির বিচিত্র কাহিনী এবং পৈপ্ললাদ শাখার পরিচয় দিয়া এক উদ্দীপনাময় বিবরণ লিখিলেন—Der Atharva-

শুগবিস্কৃত ভাষ্যসহিত ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ (সংস্কৃত কলেজ গবেষণা-গ্রন্থমালা ১৯৫৮) এবং হলারুদ্ধকৃত ব্রাহ্মণসর্বস্ব (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ-গ্রন্থমালা ১৯৬০) দ্রষ্টব্য।

২. আথর্বণ শাখার নাম নানা গ্রন্থে নানা রূপে উল্লিখিত দেখা যায়। অথর্বপরিশিষ্টের উনচত্বারিংশ অধ্যায়ে বৃত্ত শাখানামগুলি প্রামাণিক।

৩. সোমাদিত্য নামে এক ভাষ্যকার বৈতানসূত্রের ব্যাখ্যায় চারণবৈভ শাখার একটি মন্ত্রপাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা<sup>৩</sup> অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি—(Materials for Further Study of the Vaitanasutra, *Our Heritage*, Vol. V, p. 27)। কৌশিকসূত্রে (৮৭।৭, ৮) বেদদর্শ ও শৌনক শাখার মধ্যে মতভেদের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন শাখার নামে কয়েকখানা অথর্বোপনিষৎও পাওয়া যায়।

veda in Kaschmir। এই বিবরণ ১৮৭৫ সালে রাজার জন্মদিনের উৎসবে জার্মানীর প্রাচ্যবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচারিত হইল। পৈগ্নলাদ অথর্ববেদের আবিষ্কার বেদবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ঘটনা বলিয়া সমাদর লাভ করিল। ইহার পর ১৮৭৮ সালে ফ্লোরেন্স শহরে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিজ্ঞান সম্মেলনের বিদ্যৎসমাবেশে রোট্‌ সাহেব কাশ্মীরীয় অথর্ববেদ সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইউরোপ-আমেরিকার পণ্ডিত মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। হুইটনি বলিয়াছিলেন—গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কয়টি বিশেষ গৌরবময় আবিষ্কার হইয়াছে, অথর্ববেদের পৈগ্নলাদসংহিতা তন্মধ্যে একটি।<sup>৪</sup> রোটের মৃত্যু পর ১৯০১ সালে তুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড গার্বে (Garbe) এবং বার্টিমোর জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মরিস ব্লুমফিল্ড (Bloomfield) ক্রোমোফটোগ্রাফির সহায়তায় সমগ্র পুথিখানার ছবি তুলিয়া লইলেন।

### কাশ্মীরীয় আবিষ্কারের ব্যর্থতা

কিন্তু পণ্ডিতেরা ক্রমেই বুঝিলেন—কাশ্মীরী পুথিখানা কেবল অসম্পূর্ণই নয়, অর্থবোধেরও অযোগ্য। ইহার আদিতে ও মধ্যে পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, বহুস্থলে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছিল এবং আত্মস্ব অবিস্মাররূপে ভুলে পরিপূর্ণ ছিল।

তথাপি বিষয়ের গুরুত্ববোধে অধ্যাপক এল্. সি. ব্যারেট (Barret) আমেরিকার ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির বিখ্যাত মুখপত্রে কিস্তিতে কিস্তিতে দীর্ঘকালের চেষ্টায় (১৯০৬-১৯৪০) গ্রন্থখানি রোম্যান অক্ষরে প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার অহুমানমত কিছু কিছু পাঠ পরিবর্তিত করিয়া দিলেন। কাশ্মীরি ছাড়া অন্তর্জ পৈগ্নলাদ শাখার সন্ধান না পাইয়া পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিলেন—কাশ্মীরের বাহবে এই শাখার চলন ছিল না; হুতরায় পৈগ্নলাদসংহিতার নামকরণ হইল ‘কাশ্মীরীয় অথর্ববেদ’।

ইহার পর অধ্যাপক রঘুবীর দেবনাগরী লিপিতে গ্রন্থখানি যথাদৃষ্ট ছাপিয়া দিলেন। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থ প্রস্তুতিতে, তারকাচিহ্নে এবং বিন্দুচিহ্নিত শূন্য স্থানে কণ্টকিত হইয়া রহিল। মূল বস্তুর ক্রটিতে বিদ্বজ্জননের বিপুল অধ্যবসায় প্রায় নিষ্ফল হইয়া গেল।

এল্. সি. ব্যারেট প্রারম্ভে বলিলেন—পুথিখানার বিস্ময়কর অপপাঠ এবং বিচিত্ররূপ বৈশিষ্ট্যের ফলে পাঠশুদ্ধির যথাযথ চেষ্টাই দুষ্কর।<sup>৫</sup> পরে নবম কাণ্ডের ভূমিকায় (JAOS,

৪. "...one of the most important finds in Sanskrit literature of the last half-century."—Introduction to the *Atharvavedasamhitā*, Harvard Oriental Series, Vol. 7, p. xvi.

৫. "The startlingly corrupt and varied condition of the manuscript has made it difficult to maintain a good balance in attempting emendations."—*Journal of the American Oriental Society*, Vol. 26, p. 197.

Vol. 42, p. 105) তিনি ছুঃখ করিয়াছিলেন—“পৈগ্নলাদ আমাদের হতাশ করিয়াছে। উহার মন্ত্রপাঠ যে এত অধিক অশুদ্ধিহুই তাহা পূর্বে বুঝা যায় নাই।” সি. আৰ. ল্যানম্যান (Lanman) পুথিখানার আখ্যা দিলেন—“অপাঠস্থলিতরত্নাকর” তুল্যকটির ধনি।\* পল্‌ ভীমে (Thieme) বলিয়াছেন—এখানা জ্ঞানপ্রসারের কার্যে প্রায় মূল্যহীন।\* ভীমে নানারূপ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া স্থির করিলেন—পৈগ্নলাদ অথর্ববেদ ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং ঐ অঞ্চলেই এই শাখার প্রসার নিবন্ধ ছিল।\* বর্তমান সময়ে কাশ্মীরের আর্থর্ব সম্প্রদায়ের সঙ্গে পৈগ্নলাদ শাখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাই পণ্ডিতগণ ধারণা করিয়া লইলেন। দীর্ঘকালের চেষ্টায়ও কোন দ্বিতীয় পুথির সম্ভাবনা পাওয়ায় সাহিত্যের প্রকৃত পাঠ উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা রহিল না। ল্যানম্যান আক্ষেপ করিয়া লিখিলেন—যেহেতু আজ পর্যন্ত ভূর্জপত্রের পুথিখানার আর কোন প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইল না, এই পুথিতে কাশ্মীরীয় অথর্ববেদের প্রকৃত স্বরূপ কতখানি বিদ্রুত হইয়া আছে, তাহা হয়ত আমরা কোন দিন জানিতে পারিব না।\* মরিস্ ব্রুমফিল্ড্ কাশ্মীরী পুথির ছবি তুলিবার পর বুঝিয়াছিলেন যে, পুথির মন্ত্রগুলি অনেক স্থলেই নিরর্থক ও তাৎপর্যহীন শব্দের অযথা সঙ্কল মাত্র (a meaningless jumble of senseless sounds)।\* ব্রুমফিল্ড্ আর একখানা পুথি সংগ্রহের জন্ত বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, হয়ত কাশ্মীরের এক অবজ্ঞাত কোণের কোন গ্রন্থাগার এই অমূল্য পুথির প্রতিলিপি লোকচক্ষুর অন্তরালে রক্ষা করিতেছে।\*\*

৬. “...a mine of jewels of false readings and blunders”.—Introduction to Whitney’s *Atharvavedasamhita*, H. O. S., Vol. 7 lxxxviii.

৭. “almost useless for philological purposes”—*Panini and the Veda*, Allahabad 1935. p. 66.

৮. *Panini and the Veda*, p. 75.

৯. “Since the birch-bark manuscript has thus far maintained its character as a unique, we shall perhaps never know how truly it represents the best Kashmirian tradition of this Veda.”—Introduction to Whitney’s *Atharvavedasamhita*, Vol. 7, lxxix.

১০. *JAOS*, Vol. 29, p. 286 লুঃব্যা।

১১. ঐ—“I have never quit endeavouring to obtain another manuscript of this ill-fated text, and I still hope against hope that some out of the way Library in Kashmir may hide away the precious document.”

### উড়িষ্যার নূতন আবিষ্কার

কাশ্মীরের অবজ্ঞাত কোণ হইতে নয়, পূর্ব ভারতের এক অপ্রত্যাশিত প্রদেশ হইতে সম্প্রতি পৈপ্পলাদসংহিতার একাধিক অখণ্ডিত পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুথিগুলি সবই তালপাতার উপর লৌহ-শলাকা দ্বারা উৎকল লিপিতে লিখিত। এই সকল পুথিতে প্রায় দুই সহস্র নূতন মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রগুলি কাশ্মীরের পুথিতে নাই, শৌনকসংহিতায় বা অপর কোন বৈদিক সংহিতায়ও পাওয়া যায় না। বেদবিজ্ঞাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সকল মন্ত্র নূতন আলোকপাত করিবে বলিয়া আশা করি।

### নূতন পুথি আবিষ্কারের ইতিহাস

পূর্ব ভারতে পৈপ্পলাদ শাখার আবিষ্কারকথা বড় বিচিত্র। কয়েক বৎসর পূর্বে পূর্ব ভারতে বেদচর্চার অবস্থা সম্পর্কে অম্বুসঙ্কানপ্রসঙ্গে বাংলাদেশের দুইখানা প্রাচীন দানলিপিতে আমার দৃষ্টি পড়ে—একখানা দিনাজপুর জেলায় বেলোয়া গ্রামে প্রাপ্ত তৃতীয় বিগ্রহপালের তাম্রশাসন, আর একখানা পাবনা জেলার মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন। উভয় শাসনেই ভূমির গ্রহীতা ছিলেন অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণ—পিপ্পলাদশাখাধ্যায়ী স্রীমাংসাব্যাকরণতর্কবিদ জয়ানন্দ শর্মা<sup>১২</sup> এবং কৌশিকসগোত্র অথর্ববেদপৈপ্পলাদশাখাধ্যায়ী ঐগোবিন্দ শর্মা<sup>১৩</sup>। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে এবং তৎপূর্ব শতকে বাংলাদেশে পৈপ্পলাদ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন—দুইখানি তাম্রশাসনের সাক্ষ্যে তাহা প্রমাণিত হইল। অথচ এতদিন সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে, কাশ্মীরের বাহিরে পৈপ্পলাদ শাখার অস্তিত্ব ছিল না। ইহার পর জাগরুক দৃষ্টি লইয়া আরও অম্বুসঙ্কানে প্রবৃত্ত হইলাম। পিপ্পলাদের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপনিষৎগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষার ফলে গোপালতাপনীর উপনিষদের টীকায় এক নূতন ইঙ্গিত মিলিল। টীকাকার বলদেব বিজ্ঞানভূষণ গোপালতাপনীর পরিচয়ে লিখিয়াছেন—এখানা পৈপ্পলাদ শাখার উপনিষদ, উৎকল প্রভৃতি দেশের আথর্বণিকেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন।—

উৎকলাদ্বিত্তিরাথর্বণিকৈরধীয়মানা পৈপ্পলাদশাখাস্তঃস্থিতেনঃ গোপালোপনিষৎ।  
উৎকল প্রদেশে অল্পমাত্র অম্বুসঙ্কানেই বিজ্ঞানভূষণের উক্তি যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইল।

### চল্লিশ হাজার পৈপ্পলাদীর সন্ধান

উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও বিহাররাজ্যের কোন কোন স্থানে আজও প্রায় চল্লিশ হাজার পৈপ্পলাদী বাস করিতেছেন। যেদিনীপুরের কাঁধি মহকুমায়,

১২. মনোরঞ্জন গুপ্ত, Two New Pala Records, *Journal of the Asiatic Society*, 1951, p. 18.

১৩. ননীগোপাল মজুমদার, *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, p. 112.

সিংভূমের ধলভূম পরগণায় এবং ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর, কটক ও পুরী জেলার গ্রামে গ্রামে আমি নিজেই সহস্রাধিক পৈপ্পলাদী দর্শন পাইয়াছি। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এই সকল অনাড়ম্বর পৈপ্পলাদী ব্রাহ্মণ স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহাদের স্বতন্ত্র সংস্কারাদি ক্রিয়াকলাপ পালন করিয়া আসিতেছেন। আজকাল কৃষিকর্ম ইহাদের মুখ্য জীবিকা। কিন্তু ইহাদের মধ্যে এখনও অনেকেই এমন আছেন, যাহারা সম্প্রদায়পরম্পরায় মুখে মুখে শ্রুতিমন্ত্র আয়ত্ত করিয়াছেন এবং পবিত্র মন্ত্রগুলি ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে প্রাচীন প্রণয় পাঠ করিয়া থাকেন। দুই তিন পুরুষ পূর্বেও ইহাদের পূর্বজগণ বিশকাণ্ড অথর্ববেদেব সমস্ত মন্ত্রই স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। প্রাচীনকালেও বেদপাঠবিষয়ে পৈপ্পলাদশাখীর খ্যাতি ছিল। পাপিনি একটি শ্লোকে করিয়াছেন ‘অনোরকর্মকাং’ (১।৩।৪২) — অল্প-পূর্বক বদ্ ধাতুর অকর্মক প্রয়োগে আত্মনেপদ হয়। অল্প উপসর্গযোগে বদ্ ধাতুর অর্থ হয় অল্পকরণে পাঠ করা। কাশিকাকার ‘অনোরকর্মকাং’ শ্লোকে উদাহরণ দিয়াছেন—‘অল্পবদতে মোদঃ পৈপ্পলাদস্ত’ অর্থাৎ মোদশাখী পৈপ্পলাদশাখীর অল্পসরণে বেদ পাঠ করেন। মোদ ও পৈপ্পলাদ এই উভয়শাখীয় অথর্ববেদীর নাম মহাভাষ্যে আছে। মনে হয়—বৈদিক মন্ত্রপাঠে পৈপ্পলাদ-গণের অধিক নৈপুণ্য ছিল। সম্প্রতি উড়িষ্যার অথর্ববেদীয়গণ আমার অহুরোধে বারিপদা শহরে এক সভায় মিলিত হইয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত কয়েকজন বৈদিকের বেদপাঠ রেকর্ডে তুলিয়া আনিয়াছি’<sup>১০</sup>।

বেদবিজ্ঞার অমূল্য গ্রন্থ পৈপ্পলাদসংহিতার তালপাতার পুথিই উৎকলীয় পৈপ্পলাদীগণের পরম ঐশ্বর্য। ইহাদিগের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি এই ঐশ্বর্য পুরুষাচ্ছক্রমে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সমগ্র বিশ্বসমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র। অথচ ইহাদের অস্তিত্বের কথা এতদিন অজ্ঞাত ছিল। আমার সৌভাগ্যবলে গত চারি বৎসরে আমি বারংবার ইহাদের সান্নিধ্যলাভ করিয়াছি এবং ইহাদের যত্নরক্ষিত অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। কেবল মূল সংহিতাই নয়, এমন সব গ্রন্থও আমার হাতে আসিয়াছে, যাহাতে পৈপ্পলাদ সম্প্রদায়ের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট পরিচয় মিলিতে পারে’<sup>১১</sup>। এই সকল গ্রন্থ

১৪. উড়িষ্যার বৈদিকগণ পুথির লেখপ্রমাদজনিত মজ্ঞাশুদ্ধিগুলি সম্প্রদায়লব্ধ মুখস্থ শ্রুতির সাহায্যে শুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন। ‘কাশ্মীরের পুথিতে (পৈ. সং ১২।৪৮।১৭) একটি মন্ত্রের পাঠ ছিল—‘বিশামীশানঃ’। ইহার কোন অর্থ হয় না। ব্যারেই সাহেব আত্মমানিক পাঠ দিয়াছিলেন—‘বিশা মেশানঃ’। ইহাতেও অর্থ হয় নাই। বারিপদার বৈদিক পাঠ করিয়াছেন—‘বিশামীশানঃ’=বিশাং মজ্ঞাশাণাম্ দীশানঃ অধিপতিঃ=মজ্ঞাশাখিগণের অধীশ্বর। সুন্দর অর্থ হইল। নবাবিকৃত তালপাতার পুথি মিলাইয়া দেখিয়াছি—ইহাই শুদ্ধ পাঠ।

১৫. সংহিতা, কল্প ও কর্মপদ্ধতির পুথিগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে—

(ক) — বিশকাণ্ড সংহিতা :

(১) ১-৫ কাণ্ড

জেলা পুরী, বাহুবদেবপুর

যথাযথ সম্পাদিত হইলে বৈদিক সাহিত্যে এক অপূর্ব অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিবে এবং একটি

• বিশিষ্ট বৈদিকশাখা সম্পর্কে নানা তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে।

পরম বিশ্বাসের কথা এই যে, উড়িষ্যার অথর্ববেদগোণ অত্রবেদীয় ব্রাহ্মণগণের নিকট অপাংজ্যেয় হইয়া আছেন। সমাজের প্রবীণ পণ্ডিতগণ এবং পদস্থ ব্যক্তিগণ পৈগ্নলাদ শাখার গৌরবের কথা কিছুই জানেন না। অথচ এক সময়ে উড়িষ্যার রাজারা বহুসংখ্যক ‘শাসন’ দান করিয়া পৈগ্নলাদী ব্রাহ্মণদিগকে রাজধানীর চতুর্দিকে গ্রামে গ্রামে স্থাপন করিয়াছিলেন<sup>১০</sup>। সম্ভবতঃ অভিচারক্রিয়ায় পোরোহিত্য করিয়া পৈগ্নলাদ ব্রাহ্মণগণ সমাজে অবজ্ঞাতাজন হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পরম নিষ্ঠাবান, সকলেই নৃসিংহদেবের উপাসক।

### পৈগ্নলাদসংহিতার প্রথম মন্ত্র

প্রাচীনকালে পৈগ্নলাদসংহিতাই সর্বজনগ্রাহ্য অথর্বশাখারূপে আদৃত হইত। সে বিষয়ে বড় প্রমাণ এই যে, এই সংহিতার প্রথম মন্ত্রটি আজও ভারতবর্ষের সর্বত্র অথর্ববেদের স্বাধ্যায়-কর্মে পঠিত হইয়া থাকে। দ্বিজগণের পক্ষে প্রতিদিন স্বাধ্যায় বা ব্রহ্মযজ্ঞ অবশ্য অন্তর্ভুক্ত। স্বাধ্যায়কালে চারি বেদ হইতে অন্ততঃ প্রথম চারিটি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। অথর্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণে (১, ২২) স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়—‘শম্নো দেবীরভিষ্টয়ে’ ইত্যাদি মন্ত্রটিকে আদিক্রমে গ্রহণ করিয়া অথর্ববেদ পাঠ করিতে হইবে।—

শম্নো দেবীরভিষ্টয়ে ইত্যেবমাদিৎ কৃত্বা অথর্ববেদমধীয়ীত।

মন্ত্রটি শৌনকশাখীয় অথর্ববেদসংহিতার ১ম কাণ্ডের ৬ষ্ঠ সূক্তের ১ম মন্ত্র। শৌনকশাখার আদিমন্ত্র “যে ত্রিষপ্তাঃ” ইত্যাদি, ‘শম্নো দেবীরভিষ্টয়ে’ ইত্যাদি নয়। বিভিন্ন গৃহসূত্রে ‘শম্নো দেবী’ই অথর্ববেদের আদিমন্ত্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছে।<sup>১১</sup> মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি

(২) ১-৫, ১৬, ১৭-২০

জেলা বালেশ্বর, মহাস্থিপুরা

(৩) ১-৫, ১৬, ১৭-২০

জেলা পুরী, জগন্নাথপুর

(৪) ৬-১৫

জেলা বালেশ্বর, মাকন্দা

(খ) আদ্বিরসকল্প

কর্মপঞ্জিকা

অপ্রকাশিত উপনিষৎ

জেলা পুরী, জগন্নাথপুর

জেলা পুরী, নির্মলা

(গ) কর্মসমুচ্চয় (বঙ্গাক্ষরে লিখিত) জেলা মেদিনীপুর, কচুয়া

১৬. উড়িষ্যার রাজগণ যথাশাস্ত্র কার্য করিয়াছিলেন। কর্মপঞ্জিকায় আছে—রাজা জিতেন্দ্রিয় অথর্ববেদী ব্রাহ্মণকে বিশেষ দান ও সম্মানদ্বারা সতত পূজা করিবেন।—

তস্মাদ্রাজা বিশেষণ অথর্বব্রাহ্মণং জিতেন্দ্রিয়ম্। দানসম্মানসংস্কারৈর্নিত্যং সমভিপূজয়েৎ ॥

১৭. ভারদ্বাজ গৃহসূত্রে (৩, ১৫), বোধায়নীয় গৃহসূত্রে (২, ৯, ৫) এবং বৈথানসগৃহ্য সূত্রে (৬, ১৭) দ্রষ্টব্য।

পশ্চাৎশাহিকের গোড়ায় ‘শমো দেবী’ মন্ত্রটিকে অথর্ববেদের প্রতীক রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই মন্ত্রটি দিয়াই উড়িষ্যার পৈপ্পলাদসংহিতার আরম্ভ। কাশ্মীরী পুথির প্রথম পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এতদিন পৈপ্পলাদ শাখার আদিমন্ত্র সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রদায়বিদগণ যে ব্রহ্মযজ্ঞে অথর্ববেদের আদিরূপে ‘শমো দেবী’ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহার কারণও এত দিন অস্পষ্ট ছিল। উড়িষ্যার পুথি এই সকল সমস্তার সমাধান করিয়া দিয়াছে। মন্ত্রটি পৈপ্পলাদসংহিতার প্রথম মন্ত্র।

### পৈপ্পলাদ শাখার গৌরব

পৈপ্পলাদসংহিতা প্রাচীন কালের বহুমান্ত অথর্ববেদ। সেকালের দিকপাল আচার্যগণ এই সংহিতাকেই অথর্ববেদ বলিয়া মানিতেন। বাদরায়ণ মুনি ব্রহ্মসূত্রে (২।২।৪৩) ‘একে’ বলিয়া একটি প্রমাণভূত আশ্রয়বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—‘দাশকিতবাবিষ্মমধীযত একে’ [কোন এক বেদশাখী ঋতিমন্ত্রে ব্রহ্মের দাশকিতবাদি ভাব উল্লেখ করেন]। এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, সূত্রকার ‘একে’ এই পদে এক আথর্বণ শাখীকে লক্ষ্য করিয়াছেন। এই শাখীয়গণ তাঁহাদের শাখার ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, দাশ(মৎস্রজীবী)ও ব্রহ্ম, দাস(কর্মকর)ও ব্রহ্ম, আবার কিতব(দ্যুতকার)গণও ব্রহ্ম। এই কথা বলিয়া শঙ্কর পৈপ্পলাদ শাখার ব্রহ্মসূত্রের মন্ত্রটি (৮।৯।১০) তুলিয়া দিয়াছেন।—

একে শাবিনো দাশকিতবাদিভাবং ব্রহ্মণ আমনন্ত্যাথর্বণিকা ব্রহ্মসূত্রে—“ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্মেবেমে কিতবাঃ।”<sup>১৮</sup>

এই ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, বাদরায়ণ ও শঙ্করাচার্য পৈপ্পলাদসংহিতার অধীতী ছিলেন।

পাণিনি ও পতঞ্জলি উভয়েই পৈপ্পলাদ শাখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাহা পল্‌তীমে প্রমাণ করিয়াছেন।<sup>১৯</sup> পাণিনীয় মহাভাষ্যের বৈদিক প্রকরণে পতঞ্জলি পৈপ্পলাদসংহিতা হইতে উদাহরণ তুলিয়াছেন—তাহা অনেক স্থলে বুঝা যায়। পল্‌তীমে তাহা বুঝিয়াছেন, তথাপি বিকলাৎ কাশ্মীরী পুথিখানি দেখিয়া তিনি স্থিরনিশ্চয় হইতে পারেন নাই। ‘অন্তঃপাদমব্যাপরে’ (৬।১।১৫) এই পাণিনীয় সূত্রের দ্বিতীয় বাতিকে পতঞ্জলি একটি উদাহরণ দিয়াছেন—‘শাতবারো অয়ং মাণঃ’। এইটি অথর্ববেদের মন্ত্রাংশ। পৈপ্পলাদসংহিতার কাশ্মীরীয় পুথিতে উহা পাওয়া যায় না। উদাহরণটি হয়ত শৌনকসংহিতা কিংবা অপর কোন অথর্বসংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে এইরূপ মনে করিয়া তীমে সাহেব বলিয়াছেন—কোন শাখার অথর্ববেদের সঙ্গে পতঞ্জলির পরিচয় ছিল, সে-

১৮ ‘ব্রহ্ম দাশাঃ’ মন্ত্রটির পাঠ কাশ্মীরী পুথিতে অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে। উড়িষ্যার পুথিতে ষথ্যষথ পাঠ আছে। কিন্তু শঙ্করের ‘ব্রহ্মেবেমে কিতবাঃ’ স্থলে উড়িষ্যার পুথিতে আছে ‘ব্রহ্মেমে কিতবা উত’। শেষোক্ত পাঠে ছন্দের বিস্তৃতি রক্ষিত হয়।

১৯. *Panini and the Veda*, pp. 66, 76 দ্রষ্টব্য।

বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের সাধ্যের বাহিরে (The Pada শাতবারো অয়ং মণিঃ is not traceable in our Paippalada manuscript. ...A final decision is not therefore within our reach.—*Panini and the Veda*, p. 66)। কিন্তু ‘শাতবারো অয়ং মণিঃ’ কাশ্মীরী পুথিতে না থাকিলেও উহা পৈপ্পলাদ-সংহিতারই মন্ত্র। উড়িষ্কার সকল পুথিতেই এই মন্ত্রটি দ্বিতীয় কাণ্ডের সপ্তবিংশ স্তরের পঞ্চম মন্ত্র। স্তত্রাং পতঞ্জলি যে পৈপ্পলাদ শাখার মন্ত্রই উদাহরণরূপে ধরিয়ছেন, তাহাতে আর কোন সংশয়ের কারণ নাই।

বিভিন্ন পুরাণে পৈপ্পলাদসংহিতার মন্ত্রই আথর্বণ মন্ত্ররূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অগ্নিপু্রাণ (২৬২ অঃ) ও বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে (২৮ঃ, ১২৭ অঃ) এক একটি ‘অথর্ববিধান’ অধ্যায় আছে। উক্ত বিধানে উদ্ধৃত মন্ত্রপ্রতীকগুলি পৈপ্পলাদসংহিতায়ই পাওয়া যায়।<sup>১০</sup>

সমস্ত আথর্বণ শাখার মধ্যে পৈপ্পলাদ শাখা এক সময়ে সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল—‘শমো দেবী’ মন্ত্রের বিশ্বজনীন স্বীকৃতি সে বিষয়ে বড় প্রমাণ।

### পিপ্পলাদ ঋষির শাখা প্রবর্তন

ঋন্দপুরাণের (মাহেশ্বর খণ্ড, ১৭শ অঃ, ১১শ শ্লোক) একটি আখ্যায়িকায় পিপ্পলাদ ঋষি অথর্ববেদের সংস্কারকর্ম ও শাখাপ্রবর্তনের নায়করূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। পুরাকালে অথর্ববেদ শত শাখা ও শত কল্পে বিভক্ত ছিল। পিপ্পলাদ দেবাদেশে প্রাণিগণের হিতার্থে বহুধাবিভক্ত অথর্ববেদকে নব শাখায় ও পঞ্চ কল্পে বিভক্ত করেন।

অথর্ববেদো যশ্চৈষ শতশাখো বিনিমিতঃ।

শতকল্পশ্চ গুটার্থো ভূতানাং কার্যসিদ্ধয়ে।

নবশাখঃ পঞ্চকল্পস্তয়া কার্যঃ স্খাবহঃ ॥

এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য এই যে, অথর্ববেদের সকলনে পিপ্পলাদের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক।

### পৈপ্পলাদ অথর্ববেদের বিষয়বস্তু

পৈপ্পলাদসংহিতা পরিপূর্ণরূপে অথর্ববেদের লক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থ। অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা আভিচারিক বেদও বটে ব্রহ্মবেদও বটে, একাধারে ঐহিক এবং পারত্রিক বিষয়ে সমৃদ্ধ। পৈপ্পলাদসংহিতা সম্পর্কে এই লক্ষণ যেমন ঘাটে, অপর সংহিতা সম্পর্কে তেমন নয়। এই সংহিতার মন্ত্রের মধ্যে মানুষের সহজাত আশা আকাঙ্ক্ষা এবং পাপধব প্রবৃত্তিও যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, পরব্রহ্মের সত্যস্বরূপও তেমনই নির্ণীত হইয়াছে।

২০. সংস্পাদিত ‘অথর্ববিধান’ দ্রষ্টব্য—*Lights on the Paippalada Recension of the Atharvaveda, Our Heritage*, Vol. III, p. 9.

পৈগ্নলাদসংহিতার ব্রহ্মসূক্ত শৌনকসংহিতায় পাওয়া যায় না ; দার্শনিক কথা পৈগ্নলাদ-সংহিতায়ই অধিক। ‘পৈগ্নলাদং মোক্ষশাস্ত্রম্’—ইহা গর্তোপনিষদের কথা। ব্রহ্মকে জানাইয়া দেয় বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মবেদ। অপর তিন খানা বেদ (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ) দিয়া যে কার্য সম্পন্ন করা যায় না, এই বেদদ্বারা তাহা সাধিত হয়—ইহা নবলব্ধ উৎকলীয় আদিরসকল্পের উক্তি।—

ব্রহ্মণো বেদনাঙ্কেতোত্র ব্রহ্মবেদোহয়মুচ্যতে ।

যদসিদ্ধং ত্রিভিবেদৈস্তদনেনৈব সিধ্যতি ॥

অথর্ববেদের ঐহিকত্বের লক্ষণও পৈগ্নলাদ সংহিতায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। ঐহিকতার দুইটি রূপ—শাস্ত ও ষোর। শাস্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম শাস্ত ; মারণ; উচ্চাটন প্রভৃতি আভিচারিক কর্ম ষোর। পৈগ্নলাদসংহিতায় এই বিবিধ কর্মের উপযোগী মন্ত্র প্রচুর আছে। শৌনকসংহিতায়ও আছে, কিন্তু তুলনায় কম। ইহাতে রোগনাশ, স্বাস্থ্যরক্ষা, সমুজ্জ্বলাভের কথাও যেমন আছে, শত্রুপীড়ন, প্রতিপক্ষবিনাশ, বশীকরণের কথাও তেমনই আছে। বক্তৃত্ত্বপ্রয়োগপদ্ধতি নামে একখানি পৈগ্নলাদ পদ্ধতিগ্রন্থে দশটি আধর্বণ ক্রিয়ার নাম আছে এইরূপ—

শাস্তিকং পৌষ্টিকঞ্চৈব বশঃ স্তম্ভনমোহনে ॥

ধ্বষণোচ্চাটনে চৈব মারণাকর্ষণে তথা ।

বিজ্রাবণমিতীমানি দশ কর্মণ্যথর্বণাম্ ॥

এই দশটি ইহলোকসম্পর্কিত ক্রিয়ায় অথর্ববেদের উপযোগিতা আছে বলিয়াই ইহা ঐহিক বেদ।

### অনুসন্ধান পৈগ্নলাদ গ্রন্থ

উড়িষ্যায় আভিচারিকপদ্ধতিগুলি এখনও স্থানে স্থানে সুরক্ষিত রহিয়াছে<sup>১১</sup>। কিন্তু আমি আজও পৈগ্নলাদ ব্রাহ্মণগ্রন্থের কোন সন্ধান পাই নাই। অথচ অষ্টাধ্যায়াত্মক পৈগ্নলাদ ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাইয়াছি<sup>১২</sup>। কালে কালে হয়ত পৈগ্নলাদ ব্রাহ্মণও পাওয়া যাইবে।

২১. পৈগ্নলাদীগণ অবশুই অভিচারাদি ক্রিয়াকাণ্ডে নিপুণ ছিলেন। অথর্বপরিশিষ্টে (২, ৩, ৫ ; ২, ৩, ৬) পৈগ্নলাদ গুরুর বিশেষ প্রশংসা পাওয়া যায়।—

পৈগ্নলাদং গুরুং কুর্ধাচ্ছ্রীরাষ্ট্রারোগ্যবধনম্ ॥

গুরুণা পৈগ্নলাদেন বেদমন্ত্রবিপশ্চিতা ।

বর্ধতে ধনধাঞ্জন রাষ্ট্রমেবং ন মংশয়ঃ ॥

২২. প্রপঞ্চসুদয় (ত্রিবেঙ্গাম, পৃঃ ২) দৃষ্টব্য :—

আধর্বণিকপৈগ্নলাদশাখায়াং যজ্ঞো বিংশতিকাপ্তঃ...তদ্ব্রাহ্মণমষ্টাধ্যায়াত্মকম্ ।

ঋগ্বর্ধনীপিকার অনুক্রমণীভাগে (৪, ১) বেকটমাধবও পৈগ্নলাদ ব্রাহ্মণের নাম করিয়াছেন।

গুর্জরদেশেও যে পৈশ্বলাদ শাখার প্রসার ছিল, একখানি অপ্রকাশিত উপনিষদ্ভায়ে তাহার উল্লেখ পাইয়াছি। ভাষ্যকার 'গোপালতাপনী'র পরিচয়ে বলিয়াছেন—এখানি গুর্জরাদিদেশীয় পরাশরগোত্রব্রাহ্মণপাঠিত পৈশ্বলাদশাখার স্রুতিগ্রন্থ।—

গুর্জরাদিদেশপ্রসিদ্ধপরাশরগোত্রব্রাহ্মণসম্প্রদায়প্রাপ্তাথর্ববেদস্ত পৈশ্বলাদশাখাপাঠিত-

ঐগোপালতাপন্যাস্রুতিঃ।

বর্তমান সময়ে গুর্জরদেশে পরাশরগোত্র পৈশ্বলাদ ব্রাহ্মণদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্ত এবং সম্ভব হইলে, তাঁহাদের নিকট তথ্য সংগ্রহেব জন্ত কোনও অমুসন্ধিৎসু ব্যক্তির গুজরাত প্রদেশ পরিভ্রমণ আবশ্যক।

বিভিন্ন গ্রন্থে পৈশ্বলাদ পঞ্চকল্পের নাম পাওয়া যায়—নক্ষত্রকল্প, বৈতানকল্প, সংহিতাকল্প, আদ্রিসকল্প ও শাস্তিকল্প। উড়িষ্যায় একখানা আদ্রিসকল্পের পুঁথি পাইয়াছি। বৈতানসূত্র, সংহিতাকল্প প্রভৃতি যেসকল আথর্বণকল্প ছাপা হইয়াছে, সেগুলি পৈশ্বলাদশাখীয় বলিয়া মনে হয় না। পৈশ্বলাদকল্পগুলি একদিন পাওয়া যাইবে—এইরূপ আশা আজ আর মরীচিকা মাত্র নয়।



7589

## অক্ষয়কুমার বড়াল শতবার্ষিকী

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল

বাংলায় তখন নব্যযুগ আসিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর এক দশক কাটিয়া গিয়াছে। গঞ্জে নূতন প্রেরণা জাগিয়াছে। দেশপ্রেমের বজ্রায় বঙ্গভূমি পরিপ্লাবিত। সাহিত্য নূতন আদর্শে অল্পপ্রাণিত। কাব্যে রক্তবীণা বাজিতেছে। কোথাও বিরাট সব মাছুষের অসাধারণ স্বথহুঃখের কাহিনী সিঙ্ক-কল্লোলিত ছন্দে মঞ্জিত। কোথাও বা বিগত মহিমার আর্ন্ত আকৃতির সঙ্গে মুক্তির উদগ্র সম্বলবাণী রক্তরোষণর্জনের মত ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। শৌর্য, বীরত্ব, পরাক্রম, পরাধীনতার দারুণ প্লানি, স্বাধীনতা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, বন্ধনমোচনের দুর্বীর আগ্রহ— এই সব সে-যুগের কবিকুলের রচনার বিষয়বস্তু। মহাকাব্যের গম্ভীর নির্ঘোষ এবং দেশাত্মবোধের কবিতার উচ্চ নিনাদে বঙ্গসাহিত্যের আকাশ অল্পরপিত। ঠিক এমনি সময়ে সঙ্গীতময় এক যুহু স্বর শোনা গেল।

গঙ্গা বহে কুলু কুলু                      যেন ঘুমে ঢুলু ঢুলু  
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়,  
মাঝিরা নিমগ্ন মনে ঝুমুর পুরবী গায়।

অথবা,

উঠ প্রেমসী আমার মেল নলিন নয়ান

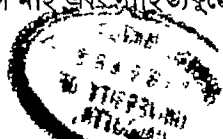
সে স্বর কেহ শুনিতে পাইল, কেহ শুনিল না। কিন্তু যাহারা শুনিল তাহারা মুগ্ধ হইয়া গেল। এই স্বরে যিনি বাঁশী বাজাইলেন, তিনি কবি বিহারিলাল চক্রবর্তী। বাংলা কাব্যে রোমান্টিসিজম প্রবর্তিত হইল। প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া বাংলার গীতিকাব্যে সেই রোমান্টিক ব্যক্তি-মানসের স্বর ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে।

কবির লোকান্তর গমনের ঠিক পরেই ১৩০১ সালের 'সাধনা'য় প্রকাশিত "বিহারিলাল" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"বঙ্গদর্শন প্রকাশ হইবাব বহুপূর্বে কিছুকাল ধরিয়া অবোধবন্ধু নামক একটি মাসিক পত্র বাহিব হইত। তখন বর্তমান লেখক বালকবয়সপ্রযুক্ত নিতান্ত অবোধ ছিল। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তিসহকারে যখন বোধোদয় হইল, তখন উক্ত কাগজ বন্ধ হইয়া গেল।...বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য্য বলা যায়, তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারার বলা যাইতে পারে।"

এই অবোধবন্ধু সম্পাদন করিতেন বিহারিলাল চক্রবর্তী এবং অবোধবন্ধুতেই তাঁহার "বঙ্গসুন্দরী" প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"সে-প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কুজিত হইয়া



উঠে নাই। সেই উষালোকে একটি ভোরের পাখী স্মিষ্ট স্তম্ভর স্বরে গান ধরিয়ছিল। সে-

স্বর তাহার নিজের।

“ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের স্বর শুনিলাম।”

প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কবিগুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের উপমাটিকে ভিন্নভাবে প্রয়োগ করিলে এই উক্তি অসঙ্গত হইবে না যে, রবীন্দ্রনাথকে যদি বাংলা রোমান্টিক কাব্যের প্রভাতস্বর্ধ্য বলা যায়, তবে বিহারিলালকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

বিহারিলাল জন্মগ্রহণ করেন বঙ্কিমচন্দ্রের তিন বৎসর পূর্বে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। উনষাট বৎসর বয়সে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ১৩০১ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,  
নহে কোন কর্ম্মী— গর্বেমত্ত-শির,  
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,  
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি,  
তবু কাঁদ কাঁদ,— জনম-ভূমির  
সে এক দরিদ্র কবি।  
এসেছিল শুধু গায়িতে প্রভাতী,  
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতী—  
আধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি,  
কুহরিল ধীরে ধীরে ;  
ঘুম-ঘোরে প্রাণী, ভাবি’ স্বপ্ন-বাণী,  
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে’।

বঙ্গসাহিত্যের স্মরণ-কবিতাবলীর মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা। শুধুই কবির প্রতি কবির শ্রদ্ধানিবেদন নহে, ইহা গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি। বিহারিলালের মৃত্যুর ঠিক পরেই এই কবিতা রচিত হয়। রচয়িতা কবি অক্ষয়কুমার বড়াল। রবীন্দ্রনাথের ত্রায় তিনিও বিহারিলালের কাব্যশিষ্য।

প্রথম-যৌবনের কবিতায় বিহারিলালের প্রভাব স্পষ্ট হইলেও পরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য নব নব রূপ ধরিতে আরম্ভ করে। স্বাভাবিক সত্ত্বেও অক্ষয়কুমারের উপর গুরুর প্রভাব শেষ পর্যন্ত কতকটা বর্তমান ছিল।

অক্ষয়কুমার মনে প্রাণে কবি। তাঁহার গদ্য রচনা নাই বলিলেই চলে। কাব্যেই তাঁহার আত্মপ্রকাশ। অপূর্ণ বাগ্‌ভঙ্গীর মধ্য দিয়া কাব্যে তিনি নিজের ভাব ও ভাবনা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। “এষা” নামটির আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী অক্ষয়কুমারকে

জাত-কবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার ছোট বড় সামান্য অসামান্য সকল কবিতার মধ্যেই এই সহজাত কাব্যপ্রতিভার সাক্ষাৎ মেলে।

১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণেব বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ‘রজনীর মৃত্যু’ অক্ষয়কুমারের প্রথম মুদ্রিত কবিতা। তখন তাঁহার বয়স মাত্র বাইশ। এই কবিতাটি হইতেই বোঝা যায় কতটা কাব্যশক্তির অধিকারী হইয়া অক্ষয়কুমার সাহিত্যজীবন শুরু করেন। এই প্রথম কবিতাতেই বিহারিলালের সহিত তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই ধরণের বিষয়বস্তু অক্ষকুমার একান্ত নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। অথবা বলিতে পারা যায়, যুগপ্রেরণার বশেই এইরূপ বিষয়বস্তু রোমান্টিক কাব্যের উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘তারকার আত্মহত্যা’ কবিতাটির নাম উল্লেখ করা চলে। বিদ্যায়ের বেদনা মাছুষেব কাছে সবচেয়ে মর্মান্বজ্জ্বল। ‘রজনীর মৃত্যু’তে কবি সেই বেদনাকে রূপ দিবার প্রয়াসী হইয়াছেন।

পশ্চিমের জলদ-শয্যায়  
পড়িয়া রজনী মৃত-প্রায়।  
দিগন্তের সুকোমল কোলে  
শুরুভার মাথাটা থুইয়া—  
আখি-কোলে অশ্রু-বিন্দু দোলে—  
দেখিতেছে একদৃষ্টে      আত্ম হারাইয়া,  
সুশান্ত বিশ্বের মুখখানি।

ছেড়ে’ যেতে চাহে না পরাণ,  
তবু না গেলেও নয়।  
আশা তৃষ্ণা সব ছেড়ে’,      স্মৃতির সাস্থনা ফেলে’,  
শূন্যে পুরিয়া হৃদয়—  
জানে না কোথায় হবে করিতে প্রয়াণ।

বিদ্যায়ের অনিবার্যতাকে মাছুষের সহ্য না করিয়া উপায় নাই। সে বার বার বলে ‘যেতে নাহি দিব’, তবু যেতে দিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতি হৃদয়হীন, তাহার কিছুতেই দৃকপাত নাই।

ব্রহ্মাণ্ডের কিছুতেই      চাহে না রহিতে বাঁধা,  
নিজ মনে ধায়।  
ব্রহ্মাণ্ড সাধিছে প্রাণপণে  
পদে পদে বাঁধিতে তাহায়।  
বৃথায়— বৃথায়।

প্রথম কবিতায় যে সুরে বীণা বাঁধা হইল, অক্ষয়কুমারের শেষের দিকের কাব্যে সেই সুর অনবস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দুঃখ ও নৈরাশ্র অক্ষয়কুমারের কাব্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এ কথা যাহারা বলেন তাঁহারা নিতান্ত ভুল করেন না। কিন্তু নৈরাশ্রবাদেই তাঁহার শেষ কথা নয়। সে কথা পরে আলোচ্য।

‘রজনীর মৃত্যু’ অক্ষয়কুমারের প্রথম কবিতাপুস্তক “প্রদীপে”ব অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রদীপের প্রকাশকাল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ, তখন কবির বয়স চব্বিশ। ইহার তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কবির পঁচিশ বৎসর বয়সে ১৮৮৫ সনে তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “কনকাকলি” প্রকাশিত হয়। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ “ভুল” প্রকাশকাল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ “শব্দ” প্রকাশিত হয় তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ১৯১০ সনে। শেষ কাব্য “এষা” তাহার ঠিক দুই বৎসর পরে ১৯১২ সনে প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে কোন-কোনটির তিনটি সংস্করণ, কোনটির দুইটি সংস্করণ হয়।

যাহারা সংস্করণ মিলাইয়া কবির কাব্য পাঠ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে তারিখগুলি প্রয়োজনীয়। সেইভাবে তাঁহারা তাঁহার কাব্যের ক্রমপরিণতির বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। কিন্তু সংস্করণে সংস্করণে কবি এতই নূতন কবিতা সম্মিষ্ট করিয়াছেন এবং পুরাতন কবিতা এমন পরিমার্জিত করিয়াছেন যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুসরণ করা কঠিন। এই প্রবন্ধে আমি সে চেষ্টা করি নাই। অত্র সংস্করণগুলি এখন দুর্লভ, বর্তমানে সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণেই অক্ষয়কুমারের সম্পূর্ণ রচনাবলী পাওয়া যায়। সমগ্রভাবে দেখিলেই বড়াল কবির কাব্যের রস কতকটা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

## ২

দুই ধরনের কবি দেখা যায়। এক, যাহাদের মধ্যে অহুত্বটিই মুখ্য, রূপ গৌণ। সেই অহুত্বটিকে যে-কোনরূপেই হোক প্রকাশ করা যাহাদের কাজ—যেমন ইংরেজী সাহিত্যে ব্রাউনিং। আর এক ধরনের কবি আছেন, যাহারা রূপ দেওয়ার মধ্যে যে কলা আছে, সেই কলাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন—যেমন কীটস্ বা টেনিসন। অক্ষয়কুমার বড়াল এই শেষোক্ত ধরনের কবি।

কাব্য কাহাকে বলিব। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল “এষা” কাব্যের “পরিচয়” দিতে গিয়া কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। “আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা বসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়াছেন।” বিপিনচন্দ্র দার্শনিক। কাজেই আমাদের পূর্বতন সাহিত্যিকবৃন্দ যে ভুল করিতেন, তাহা তিনি করেন নাই। রস বলিতে আমরা যাহা বুঝি, রস সম্পর্কে সাধারণের ধারণা তাহাই। রসের যে একটি টেকনিক্যাল শাস্ত্রগত অর্থ আছে, বিপিনচন্দ্র তাহার আভাস দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন “বাক্য—অর্থযুক্ত শব্দ।...যে বাক্য আপনার অর্থের দ্বারা হস্তাঙ্কিতকরণরূপাদি রস ফুটাইয়া

তুলে, তাহাই কাব্য।...কোন রস বিশেষের উদ্রেক করিতে পারিলেই যে কোন রচনা কাব্যত্বের দাবী করিতে পারে, এমনও নহে।”

এই সব কথা বলিয়া তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, যে রস বিশ্বজনীন তাহাই কাব্য সৃষ্টি করিতে পারে। ইহাতে কাব্য সম্বন্ধে ধারণা কতখানি পরিষ্কার প্রাপ্ত হইল জানি না, কিন্তু রসাত্মকের রস সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু বোঝা গেল তাহা নয়। আলঙ্কারিকেরা যে রসের কথা বলেন, তাহার মোটামুটি স্বরূপ এই।

দুঃখ স্বর্থ আনন্দ শোক সব মাহুযই অমুভব করে। যে অমুভবে সংসারের মাহুয কীদে হাসে কাতর হয় চকিত হয় চঞ্চল হয়, সে অমুভূতি লৌকিক। কবির অমুভূতি অমুপ্রকার। হাসি কান্নার ভিতর দিয়া সব অমুভূতি প্রকাশ পায় না, কিন্তু প্রকাশের জন্য অন্তর ব্যাকুল হইয়া থাকে। প্রকাশ-ব্যাকুল কবির সেই গভীর অমুভূতি অলৌকিক। কাব্যের মধ্য দিয়া কবি আপনাকে ব্যক্ত করেন। সহৃদয় পাঠক বা শ্রোতার মনে বাস্ময় সেই প্রকাশ সম-অমুভূতির সঞ্চার করিতে পারিলে তাহা রসে পবিণত হয়। অর্থাৎ শুধু কবির অমুভূতিই রস নয়। প্রকাশের মধ্য দিয়া পাঠক বা শ্রোতার মনে তাহা যখন সমানভাবে সাড়া জাগায়, তখনই তাহা রস। তাই অরসিকে রসের নিবেদনকে কবির এত ভয় করেন।

অক্ষয়কুমার কবি; কেননা তাঁহার বেদনা তাঁহার আনন্দ তাঁহার দুঃখ তাঁহার শোক আমাদের মনে সম-অমুভূতির সাড়া জাগায়। তাঁহার বিরহে পাঠক বিরহী হইয়া ওঠে। তাঁহার শোকে সহৃদয়জন ব্যাকুল হইয়া পড়ে। “এষা”য় যে করুণরস তিনি ফুটাইয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

মানব সম্পর্কে ঐশ্বর্য্য ও কৌতূহল বাঁহার যত অধিক তিনি তত উচ্চ শ্রেণীর কবি। মানবপ্রীতি প্রকৃত কবিত্বের এক লক্ষণ। অক্ষয়কুমারের মানবিকতা অসাধারণ। মাহুযকে ভালবাসিতে না পারিলে কবিশক্তি ব্যাহত হয়। অক্ষয়কুমার মানবপ্রেমিক। “প্রদীপে”র ‘মানব-বন্দনা’ সেই প্রীতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কবিতায় বিবর্তনবাদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে কাব্যের জগতে প্রবেশ করিয়া নবরূপ ধারণ করিয়াছে।

নমি তোমা, নরদেব ! কি গর্বে গৌরবে

দাঁড়ায়েছ তুমি !

সর্কাকে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,

পদে শ্মশুভূমি।

মানব-সভ্যতার শৈশব ও যৌবন ও পরিণতির বর্ণনার পর, শেষ স্তবকে বলিতেছেন,

নমি আমি প্রতি জনে,— আবিজ্ঞ-চণ্ডাল,

প্রভু ক্রীতদাস।

সিন্ধু-মূলে জল-বিন্দু, বিশ্ব-মূলে অণু,

সমগ্রে প্রকাশ।

নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি, তক্ষণ,

কর্ম-চর্ম-কার।

অঙ্গি-তলে শিলাখণ্ড— দৃষ্টি-অগোচর

বহু অঙ্গি-ভার !

কত রাজ্য, কত রাজ্য গড়িছ নীবে,

হে পূজ্য, হে প্রিয় !

একসঙ্গে ববেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—

আত্মাব আত্মীয় !

কবি মানবকে কোথাও ছোট করিয়া দেখেন নাই। মানবের মহত্বে তিনি বিশ্বাসী।

প্রীতিকে আহ্বান করিয়া ‘আবাহনে’ কবি বলিতেছেন,

হের, এ প্রণবে, সতী,

স্তুতিত ব্রহ্মাণ্ড-গতি ;

দূর বিষ্ণুলোক হ’তে

আশীর্ব্বাদ আসে শ্রোতে,

বব স্বর সপ্তস্বর্গ ঝরে শির’পর ।

ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় নর ।

প্রকৃতিকে তিনি নানাভাবে দেখিয়াছেন— প্রভাতে, সন্ধ্যায়, বসন্তে, বর্ষায়, অন্ধকারে, চন্দ্রালোকে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু মানুষকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতি তাঁহার নিকট কোথাও বড় হইয়া উঠে নাই। ‘আবণে’ কবিতাটি পল্লীপ্রকৃতির নিখুঁত বর্ণনার উদাহরণ।

সারা দিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ

রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ;

বনে’ জানালার পাশে, সারা দিন আছি চেয়ে—

জীবনের আজি অন্ধকার !

কচিং অশ্বখ-তলে, ভিজিছে একটা গাভী ;

টোকা মাধে যায় কোন চাষী ;

কচিং মেঘের কোলে, মুমূর্ষু হালি সম,

চমকিছে বিজলীর হালি ।

মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে কচি কচি ধান-গাছ

মাথাগুলি জাগাইয়া আছে—

কোলেতে লুটিছে জল টল্-বল্ থল্-থল্

বুকে বায়ু ধর-ধর নাচে ।

কবিতাটিতে তিনি ছবির পর ছবি আঁকিয়া চলিয়াছেন। এই চিত্রধর্ম্মিতা তাঁহার কাব্যে অনেক সময় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

৩

অক্ষয়কুমারের কাব্যে নারী শ্রেষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃতির পূজা এবং নারীর বন্দনা রোমান্টিক কবিতার এই দুইটি লক্ষণই তখনকার কাব্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র “বঙ্গসুন্দরী” নারীবর্ণনার কাব্য বলিলেই চলে। বিভিন্ন কবির নিকট নারী বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে। বিহারিলাল নারীকে দেবীত্ব উন্নীত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট নারী মানবী বটে কিন্তু ‘অর্দেক মানবী তুমি, অর্দেক কল্পনা’। দেবেন্দ্রনাথ সেন বলিয়াছেন, ‘রূপের পূজারী আমি রূপের পূজারী’। অক্ষয়কুমারের নিকট—

রমণী রে, সৌন্দর্য্যে তোমার

সকল সৌন্দর্য্য আছে বাধা।

নারী শুধু সৌন্দর্য্যরূপিণী নয়

এ নির্মম জীবন-সংগ্রামে

তুমি বিধাতার আশীর্বাদ।

‘অন্তেদে প্রভেদ’ কবিতায় নারীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

তুমি বিধাতার সৃষ্টি, কঠোরে কোমল মুষ্টি,

শুষ্ক জড় জগতের নিত্য-নব ছলা!

শুধু তাই নয়, সম্যাসী শিবকে হৃদয়ের হইতে কে শিখাইল?

তোমারি প্রণয়-স্নেহ বাধিল কৈলাস-গেহ,

পাংগলে করিল গৃহী, ভূতে মহেশ্বর।

শেষে কবি বলিতেছেন, দুয়ের প্রয়োজন, জীবন একে অসম্পূর্ণ, তুমি ও আমি নহিলে সংসার চলে না।

যে দিকে ফিরিয়া, গিয়া, দেখ একবার—

আমাদেরি দুই বলে, এই ভেদাভেদচ্ছলে,

ঘুরিছে ব্রহ্মাণ্ড-চক্র, চলিছে সংসার।

অক্ষয়কুমারের কাব্যে নারী সম্পর্কে কবি মোহিতলাল মজুমদারের উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। “এষা” সম্বন্ধেই সম্ভবতঃ বিশেষভাবে প্রযোজ্য। “বান্ধালী কবির দাম্পত্যপ্রীতি নারীর একটি মহিমময়ী মুষ্টি না গড়িয়া পারে না; মধুসূদন যাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, বিহারিলাল যাহাকে আপন ইষ্টদেবতার আসনে বসাইয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ যাহাকে সংসারে ও সমাজে তাহার শ্রায়সম্বত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ভাব-ভোলা কবিশ্বের আবির্ভাব-কুঙ্কমে যাহার অর্চনা করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার তাহাকেই বান্ধালীর গৃহপ্রাঙ্গণে নিত্য লক্ষ্মীপূজার উৎসবে—বাস্তব স্বপ্নজগতের গন্ধপুষ্প ও জগতীর স্নেহরসের আলিপনায় হৃদয়েশ্বরীরূপে বন্দনা করিয়াছেন।”

উপরিউক্ত সব কবিতাই “প্রদীপ” হইতে উদ্ধৃত। নূতন এবং প্রায় নূতন অনেক ভাল কবিতাই কবি প্রদীপের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সম্মিলিত করিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার প্রেমের কবি। প্রেমকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। মিলনে বিরহে, নিকটে দূরে, বাস্তবে কল্পনায়, আহ্বানে আকৃতিতে তিনি নানাভাবে প্রেমকে দেখিয়াছেন। প্রেম তাঁহার প্রথম কাব্য হইতে শেষ কাব্য পর্যন্ত প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। জীবনে অসংখ্য বহুবিধ; রমণীকে কবি বলিয়াছেন, বিন্দুমাত্র হোক অসংখ্য মিটাইতে যতটুকু পার দাঁও—

অবশিষ্ট অপূর্ণতা— ল'বে প্রেম পূর্ণ করি'  
দিয়া নিজ কল্পনা স্বপন। —প্রেম-গীতি, “প্রদীপ”

বল, সখী, সত্য তুমি— নহ গো কল্পনা !  
সত্য— ঐব সত্য এই হৃদয়-মিলন !  
স্বপন-ছলনা নহে,— এ প্রেম-চেতনা,  
জীবনের অন্তরালে অনন্ত জীবন ! —মিলনে, “কনকাজলি”

অতএব প্রেম শুধু বাস্তব নহে, তাহাতে কল্পনা আছে। তাই তাহা অধিকতর সত্য।  
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে এস, সখি, তবে,  
রূপ-বনে প্রেম-কাব্য মিশাই নীরবে ! —আলিঙ্গন, “ভুল”  
প্রেম নারীকে অপরূপ করে। তাই কবি বলিতেছেন—

ল'য়ে প্রেম-সুধারশি এস দেবী, এস দাসী,  
এস সখী, এস প্রাণপ্রিয়া !  
এস, সুখ-দুঃখ-দূরে, জন্ম-মৃত্যু ভেঙ্গে-চূরে,  
সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়া ! —আহ্বান, “শব্দ”

মিলন নিতান্তই দৈব ঘটনা, জগতে মিলন বিরহ দুই-ই আছে।  
একটা তরঙ্গ আজ হরোছল অহুকুল,  
হয়েছে মিলন ;  
একটা তরঙ্গ রোষে আসিবে, পড়িব দূরে—  
সহস্র বোজন ! —পুনর্মিলনে, “প্রদীপ”

তখন বিরহের মধ্যে থাকে মিলনের কামনা—  
এস গো বিরহ-শ্লোকে মিলন-আশ্বাস !  
ছায়া পিছে কায়া নিয়ে  
আজীবন ছুটি, প্রিয়ে,  
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে কর দেহ নাশ। —প্রভাতে, “শব্দ”

চণ্ডীদাসের মত তাঁহার প্রেম নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়। তাঁহার প্রেম শুচি শুভ্র, হৃৎসংহত, তাহাতে আবেগ আছে, অধৈর্য্য নাই, তাঁহার প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।

দাঁড়াও, অভেদ আস্বাদ! পরলোক-বেলাভূমে,  
বাড়িয়ে দক্ষিণ-কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে!...  
দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,  
বুঝেছি এ মরভূমে মন্ত ব্রহ্মানন্দ তা-ই।

৫

মাহুষ অতৃপ্ত। তাহার বাসনা মিটে না, তাহার কামনা চিরদিন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। যাহা আছে তাহাতে তাহার স্তব্ব নাই। কি যে সে চায়, সে কথা তাহার কাছে অজ্ঞাত। কাহাকে সে চায়, তাহাও সে জানে না। কষ্টে দেবায় হবিষ্য বিধেম, এ প্রশ্নের উত্তর সে পায় নাই। এ প্রশ্ন চিরন্তন। তবু সে খুঁজিয়া মরে। যাহাকে পূজা করিব সে দেবতা কোথায়? যাহাকে ভালবাসিলে জীবন সার্থক হইবে, সে প্রিয় কোথায়? তবু সে খুঁজিয়া মরে। না পাইলে হৃদয় হাহাকারে ফাটিয়া পড়ে—

আকুল হৃদয় কঁাদে, কোথা তুমি—তুমি!—অপরাক্তে, “শব্দ”  
এই পরিতৃপ্তির স্বর সকল রোমাঞ্চিক কাব্যের নিজস্ব স্বব।

We look before and after

And pine for what is not.

এ অবিশ্রাম অন্বেষণের শেষ নাই।

বুঝিতে পারি না আমি এ খেলা কেমন!

চিরদিন ধরি-ধরি,

খুঁজিয়া—খুঁজিয়া মরি,

সেই এই-এই করি' যাবে কি জীবন?

কিন্তু এই ঈপ্সিতকে যদি পাওয়া যাইত।

এ জীবনে পূরিভ সকল,

সে যদি গো আসিত কেবল!

গানে বাকি স্বর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,

স্বপ্ন বাকি হইতে সফল—

সে যদি গো আসিত কেবল!—অপরাক্তে, “শব্দ”

এই না-পাওয়ার বিরহ, এই ব্যথা-ব্যাকুলতাকে অক্ষয়কুমার অনেক কবিতাতেই রূপ দিয়াছেন। অজানার বেদনা আমাদের হৃদয়েও সমবেদনার সাড়া জাগায়।

এইখানে আর একটি কথা বলা যায়। তাঁহার কাব্যের ভাব অর্থের মধ্যে নিবদ্ধ নয়।

অর্থকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার কাব্যের রেশ আমাদের মনে বাজিতে থাকে। বাঁক্যের শব্দগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট, তাহার মধ্যে কিছু অধিক নাই। যে শব্দবিছাসে বাঁক্যের যে অর্থ হয়, সেই অর্থকে ছাড়াইয়া তাঁহার কবিতা আমাদের মনে নানা স্মৃতি, নানা ভাব, নানা ছবি জাগাইয়া তোলে। তাঁহার কাব্য ইন্দ্রিতময়।

তাঁহার ‘গীতি-কবিতা’ শীর্ষ কবিতার প্রথম স্তবকটি এইরূপ—

ক্ষুদ্র-বনফুল-বাসে  
সারাটা বসন্ত ভাসে ;  
ক্ষুদ্র-উর্দ্ধি-মূলে বুলে প্রলয় ধাবন ;  
ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে  
চির-উষা জেগে আছে ;  
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন।—“প্রদীপ”

‘প্রদোষে’ কবিতায় আছে—

যেই আশা, যে পিপাসা,  
যেই ভাষা, ভালবাসা  
বুঝিতেছি মর্মে মর্মে স্বপনে সঙ্গীতে—  
কথায় না ধরা যায়,  
বুঝিতে না পারি, হায়,  
চাহি চারি ভিতে!—“শব্দ”

‘অপরাজে’ আছে

এ কি শুধু ভাবহীন ভাষা—

এই যে কথার পিছে প্রাণান্ত-পিপাসা !

যেটুকু বলা হইয়াছে তাহাতেই কবিতাগুলির শেষ নয়, ইহারা আরো অনেক কথা মনে করাইয়া দেয়। অব্যক্তপ্রায়কে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা কবির আগ্রহ অত্যধিক।

৬

অক্ষয়কুমারের কাব্যগুলির মধ্যে শব্দের স্থান বিশিষ্ট। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতাব অনেকগুলি শব্দেব অন্তর্গত। এই কাব্য তাঁহার পরিণত প্রতিভার ফল।

কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্ত্তি নয়,  
ধরণী চাহিছে শুধু— হৃদয়— হৃদয়।

“ভুলে” হোক, “কনকাকুলি”তে হোক বা অল্প কোন কাব্যে হোক, তাঁহার কবিতার মধ্যে কোথাও লঘু চাপল্য নাই। সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার বচনা আন্তরিকতায় পূর্ণ। স্তাবু আর্নল্ড প্রকৃত কাব্যে লক্ষণের নির্দেশ দিতে গিয়া truth and high seriousness এর

কথা বলিয়াছেন, অক্ষয়কুমারের কাব্যে সে লক্ষণ আছে। তিনি হৃদয়ের অধিকারী, অন্তরস্থিত কবিতার স্বরে আমাদের অন্তর উদ্বেলিত হয়।

‘শ্রী’ কবিতাটিতে কল্পজগতের বেদনাও তাঁহার ছন্দে ঝঙ্কত হইয়া উঠিয়াছে।

দেবী,

তোমারি চরণ-মূলে

আছি আমি বিশ্ব ভুলে’!

আমারে না হেরে’ রাধা কাঁধে উত্তরায়!

শকুন্তলা-নিত্য আসি’

হেরে মম রূপরাশি!

রত্নাবলী লতা-ফাঁসী গলে দ্বিতে যায়!

মহাশ্বেতা আমা তবে

চির ত্রস্তচর্য্য করে!

সাবিত্রী আমারে ধরে’ যমেরে তাড়ায়!

‘জয়ী’ কবিতায় কবি জীবনের সঙ্গীত কখনও পবিত্র ভীষণ, কখনও পবিত্র মধুর, আবার কখনও পবিত্র সুন্দর বলিয়াছেন। সমস্তটা মিলাইয়া—

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মহান—

জীবনের মাধুর্য্য বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মধুর—

বেহাগে আলাপে করে বাঁশরী সুদূর!

আবেশে অবশ প্রাণ,

মুদে’ আসে হৃদয়ান,

যুমে আলু-থালু ধরা— দোহাগে বিধুর।

পাপিয়া ডাকিয়া সারা,

যমুনা আপন-হারা,

কানন কুসুমে ভরা, পবন মেহুর।

কবিতাটি প্রথমে সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। তখন ইহার মধ্যে দুইটি অপূর্ণ পংক্তি ছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় পরিবর্তনেব হিড়িকে তাহা হারাইয়া গেছে।

জীবনের এ পয়া—

কিছুতে মেলে না আর

দেখি দেখি দেখি না সে মুখানি বঁধুর।

‘আহ্বানে’ কবি বলিতেছেন

শিরে শূন্য, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি তুমি—

কল্প-কল্প বিকাশ-বারতা!

আছে দেহ— আছে স্বধা, আছে হৃদি— খুঁজি স্বধা,  
আছে মৃত্যু— চাহি অমরতা !

‘সঙ্ক্যার’ আহ্বান উদ্ভাস হইয়া উঠিয়াছে—

এস, প্রিয়া— প্রাণাধিকা,

জীবন-হোমায়ি-শিখা !

দ্বিসের পাপ-তাপ হোক হতমান !

ওই প্রেমে— প্রেমানন্দে,

ওই স্পর্শে, বাহ-বন্ধে,

আবার জাগুক মনে,— আমি যে মহান,

একেশ্বর, অধিতীয়, অনন্ত-প্রধান !

“শব্দে”র শেষ কবিতাগুলি—প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সায়াহ্নে, প্রহোষে, নিশীথে ;  
প্রত্যেকটি নিজের ভাবে অপূর্ব । ‘নিশীথে’ কবিতায় কবি বলিতেছেন,

দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,

একশেষে কবিতার শেষ স্তবকে আছে,

তারকায় তারকায় হা-হা করে’ তোমা তরে

ছুটিছে না হয় যেন আবার মরণ-পরে !

এ মৃত্যু কি শেষ মৃত্যু— যজ্ঞার অবসান ?

ধর এ জীবনাছতি— বিরহের শেষ গান !

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মত অক্ষয়কুমারেরও কয়েকটি শিশু-কবিতা আছে । শব্দে  
এই শিশু-কবিতাগুলির স্থানও বিশিষ্ট । ‘মাতৃহীনা’ কবিতাটিতে অক্ষয়কুমারের ছন্দ ও  
রচনা-রীতির ছাপ স্পষ্ট না হইলেও বেদনায় তাহা মর্মস্পর্শী ।

তোমার মতন কেউ রে বাছা, চেউয়ের মতন আসে নাই—

কুল-কিনারা ভাসিয়ে দ্বিয়ে কেউ রে এমন হাসে নাই !

আলো-মাখা বৃষ্টির মতন কেউ রে এমন কাঁদে নাই !

মালার মতন শতেক পাকে কেউ রে এমন বাঁধে নাই !...

আম্ন রে গত-স্বপ্নের স্বপন, সীতের মেঘে সোনার হাসি—

জীবন-ভরা নবীন হৃদয়, কানন-ভরা কুসুমরাশি !

এক সময়ে মনে হইত, “শব্দে”ই বুঝি অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ কাব্য । খণ্ডকবিতার সমষ্টি  
হিসাবে হয়ত ইহা সত্য । কিন্তু সমগ্রভাবে “এষা” অতুলনীয় ।

“এষা” তাঁহার শেষ কাব্য । ১৯০৬ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয় । সেই বিয়োগের  
আঘাত পত্নী-প্রেমিক কবির হৃদয়কে নিদারুণভাবে বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছিল । “এষা”

সেই আর্ন্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি। ° পৃথিবীর স্রবণ কাব্যগুলির মধ্যে ইহার স্থান অনেক উচ্চে।

এক দিক্ দিয়া দেখিলে কোন মানুষের সঙ্গে কোন মানুষের মিল নাই। দেশে দেশে এবং যুগে যুগে মানুষও ভিন্নরূপ। মানুষ স্বতন্ত্র সত্য, একজনের সঙ্গে অন্যের অনেক প্রভেদ থাকিলেও মানুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। সকল পরিবর্তনের মানুষের স্বভাব অপরিবর্তনীয়। সে স্থখে আনন্দিত হয়, দুঃখে ক্রন্দন করে, সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়। মানব-প্রকৃতির মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য আছে। এক বলিয়া আমরা নিজের দুঃখে যেমন পরের দুঃখেও তেমনি কাদি, নিজের স্থখে যেমন পরের স্থখেও তেমনি হসিত হই। পরের কথা আপনার করিয়া লই বলিয়া— কাব্য আমাদের মনে আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে। এই সহানুভূতি সজ্ঞাত আনন্দ ও বেদনার আশ্বাদ লাভ করিবার সামর্থ্য আমাদের আছে, তাই কাব্য আমাদের প্রিয়। শ্রেষ্ঠ কাব্যেব একটা universal appeal— একটা সার্বজনীন আনন্দ আছে।

মনীষী বিপিনচন্দ্র বলেন, “শোক যখন শোকাক্তের ক্ষুদ্র জীবনের সম্পূর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া বিখময় পরিব্যাপ্ত হয়,—তাহার দুঃখ যখন জগতের দুঃখ, তাহার বেদনা যখন বিশ্বের বেদনা, তাহাব সমস্তা হয়, তখন সে শোক কাব্যের উপযোগী হইয়া উঠে। অক্ষয়কুমার তাঁহার “এষা”কে যে শোকের উপর গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা এই বিশ্বজনীনত্ব লাভ করিয়াছে। এই জগত্ হইয়া তাহার নিজের কথা, তাহা তোমার আমার সকলেরই কথা ও সকলেরই ব্যথা হইয়া উঠিয়াছে।”

“আমরা সহজে পরলোক বিশ্বাস করিতে পারি না, আবার বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে পারি না।...ইংরেজী সাহিত্যে লর্ড টেনিসন ‘ইন মেমোরিয়ম্’ এই ট্রাজেডির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। একটু ধীরভাবে পূর্ব সংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব-শূন্য হইয়া বিচার করিলে, বাঙ্গলা ভাষার এই সামান্য গ্রন্থখানি তাঁহার ‘ইন মেমোরিয়ম্’ অপেক্ষা মূল বিষয়ের আলোচনায় ও মূল রসের অভিব্যক্তিতে যে কোন অংশ হীন নহে বরং অনেক বিষয়েই গভীরতর ও শ্রেষ্ঠতর, এ কথা কতকটা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি।”

“এষা” যদি শুধু প্রিয়াবিরহের হাহাকার হইত তাহা হইলেও হয়ত ইহা কাব্য হইত, কিন্তু এমন শ্রেষ্ঠ কাব্য হইত না। ইহা শুধু বেদনার্ত্ত হৃদয়ের ক্রন্দন নয়, গভীর অশ্রুভবের সঙ্গে আত্মযজ্ঞিক ভাব ও ভাবনার সমন্বয়ে ইহাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দান করিয়াছে। কবি যেমন জ্ঞাতি, তেমনি জ্ঞাতিও বটে। জ্ঞাতি বলিয়া কবির সংবেদনশীল মনের মধ্যে ভাবুকের সঙ্গে একটি সমালোচকও বাস করে। শোকের সঙ্গে শোকাক্তের মনে নানা অবাস্তব ভাবের উদ্ভব হয়। সেই সব অবাস্তব ভাবের অরণ্যে প্রকৃত কল্পণ রসটি হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। অক্ষয়কুমারের শিল্পীমন অবাস্তবকে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। অবাস্তবের পরিবর্তনে মন যেটুকু রক্ষিত হয়, প্রাসঙ্গিক অল্পবদ সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করে। প্রকৃত শিল্পীই অবাস্তব হইতে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়তাকে পৃথক্ করিতে পারে।

যাঁহারা খণ্ড কবিতার সমষ্টি হিসাবে “এষা” পাঠ করিবেন, তাঁহারা ইহা আংশিকভাবে উপভোগ করিতে পারিবেন। সমগ্রভাবে পাঠ করিলেই এই স্বরণ-কাব্যধানির সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করিতে পারা যায়। সবগুলি কবিতাব মধ্য দিয়া কল্পন রসের একটি অন্তঃসলিল-প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। এই কাঞ্চণ্যের উদ্রেক করিতে কবি শুধু অন্তরের অল্পভূতি নয়, কোথাও কোথাও বাহিরের পারিপার্শ্বিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহাব জন্ম শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি শুধু কবিপ্রিয়া নন, তিনি পুত্রের জননী, কণ্ঠার মাতা, স্বপ্নের বধূ, সংসারেব গৃহিণী, দেবতাব পূজারিণী, সর্বোপরি প্রেমময়ী পত্নী। এই চিত্র ফুটাইতে পরিবেশের যতটুকু প্রয়োজন কবি তাহা গ্রহণ কবিত্তে কুঠাবোধ করেন নাই, আবার কোথাও অতিরিক্ত কিছু সাহায্যও লন নাই।

বহুবিধ দুঃখবেদনার মধ্যে সংসারে মৃত্যুই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। মৃত্যু নিমেষের ঘটনা, তাহা অবর্ণণীয়। কিন্তু বিচ্ছেদ অন্তহীন। সর্বগ্রাসী ব্যথা লইয়া মানুষের প্রাণ জাগিয়া ওঠে না; ধীরে ধীরে সে আপনার প্রভাব বিস্তার কবে।

ঘটনা ও অল্পভূতির সংস্থানে কবির কৃতিত্ব অসাধারণ। বিজ্ঞানপটু অক্ষয়কুমারের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। বিজ্ঞানের গুণে শোক ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া বিচ্ছেদকে দুর্বিসহ করিয়া এক মর্মান্তিক রূপ ধরিয়াছে। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা বলেন, “‘এষা’র কবিতার প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব—যাঁহার শোকে তিনি মুহূর্তমান তাঁহার ছবি ইহার মধ্যে কবি পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন।...ঘটনা ও তাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ‘এষা’র কবিতাগুলি পরে পরে সাজানো হইয়াছে।”

“এষা”র আদর্শবাদ ও রোমাণ্টিক হৃদয়াবেগ বাস্তবে উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কাব্যে কবির জীবনের অভিজ্ঞতার পরিচয় আমরা পাই। নানারূপ অঘটন এবং বহুবিধ দুর্ঘটনা সংসারের শাস্ত প্রবাহে আবর্তের সৃষ্টি এবং আকস্মিক বেগের সঞ্চারণ করে। তাহারই আঘাতে হৃদয়ে আলোড়ন ওঠে। মন আবেগে উচ্ছল হয়। অশান্তি যদি কবির দৃষ্টিকে একান্তভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সাংসারিক ঘটনা ও মানসিক অবস্থা—দুইই কাব্যে কবির মানসপটে অস্পষ্টরূপ ধারণ করে। “এষা”র ব্যাহত দৃষ্টির অস্পষ্টতা নাই। তাই বাহিরের চিত্র এবং অল্পভূতির অভিব্যক্তি যথার্থ হইয়া উঠিয়াছে।

কাব্যের পূর্বাভাসস্বরূপ ছুটি ছোট কবিতা আছে। তন্মধ্যে ‘নিবেদনে’র শেষ উক্তিটি এইরূপ—

নহে কল্পনার লীলা—স্বপ্ন নরক,

বাস্তব জগৎ এই, মর্মান্তিক ব্যথা।

নহে ছন্দ, ভাব-বন্ধ, বাক্য রসাত্মক,

মানবীর তবে কাঁদি—যাচি না দেবতা।

প্রথম কবিতায় কণ্ঠাব কণ্ঠাব অবতারণা করিয়া দ্বিতীয় কবিতার শেষে কবি কহিতেছেন,

শাস্ত—তৃপ্ত, ধীরে পার্শ্ব ফিরে’

করিল শয়ন—

ফুরাল জীবন !

ভূতীয় কবিতাই প্রকৃত কাব্যখণ্ড । এ যেন বিশ্বাস করা যায় না,

এই কি মরণ ?

এত দ্রুত— সহসা এমন !

চিরতরে ছাড়া-ছাড়ি, দেহে প্রাণে কাড়া-কাড়ি,

নাই তার কোন আয়োজন !

তার পর কবি আর্তস্থরে সহসা প্রশ্ন করিলেন— সে প্রশ্ন চিরন্তন,

মরণে কি মরে প্রেম ? অনলে কি পুড়ে প্রাণ ?

বাতাসে কি মিশে গেল সে নীরব আত্ম-দান ?

জীবন-জড়ান সত্য— সকলি কি মিথ্যা আজ ?

সমগ্র “এষা” কাব্যে এই প্রশ্নের উত্তর ।

কাব্যধামি চারভাগে বিভক্ত—মৃত্যু, অশৌচ, শোক ও সাস্থনা । একদা মানুষের মন সহজভাবে বিশ্বাসপ্রবণ ছিল । পুণ্যফল, পরলোক, দেবতায় ভক্তি প্রভৃতি শোকার্দের প্রাণে শাস্তি আনিয়া দিত । বর্তমান কালে ধর্ম আর বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় । মন অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে । তথাপি মানুষ সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিতে পারে না । আধুনিক মন সংশয় ও বিশ্বাসের মধ্যে ছলিতেন্ধে—এই যে ভাঙাগড়া এ কি এক অন্ধ শক্তির খেলা ? হৃদয় চূর্ণ হইয়া গেলেও তাহার প্রতি কোন আক্কেপ নাই ।

মৃত্যু তো প্রতি দিবসের সাধারণ ঘটনা । কেহ চিরঞ্জীবী নয় । তবে দুঃখ কেন ? একথা বলিলেই কি সাস্থনা আসে ? হে বিগ্রহ, যে তোমার পূজা করিত, এত ভক্তি করিত, সে নাই ; তাহাতে তো তোমার ক্ষোভ নাই । তুমি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছ, তুমি পাষণ্ড মাত্র ।

মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হয়, তবে বুদ্ধ সংসার ত্যাগ করেন কেন, নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কেন ? হয়তো লোকান্তর আছে, হয়তো স্বর্গ আছে কিংবা নাই । কবি ঋষি দার্শনিক বৃথা মানুষকে ভুলাইবার জন্য কি আর এক জগৎ গড়ে ? ভ্রান্ত মতামত লইয়া বিশ্বাস ত্যাগ করি কেন ?

সত্য দেহ, সত্য এই প্রাণ—

সত্য এই হৃৎ হৃৎ জ্ঞান ।

মৃত্যুই মিথ্যা ।

ছিদ্র, আছি যব চিরকাল

সেও আছে চোখের আড়াল

এই মাত্র ভেদ ।

সংশয় দূর কর, শাস্তিজন দাঁও,

কর বায়ু মধুগতি,  
মধুময়ী শ্রোতস্বতী,  
মধুময় বনস্পতি, মধু ফুল ফল।

কিন্তু তবু হায়,

বলি নি বলিতে ছিল কত  
লুকাইতে ছিলাম বিব্রত  
লয়ে অভিমান রাশিরাশি।

কেন বার বার বলি নি ভালবাসি বড় ভালবাসি।

বহু দিবা সংশয়ের মধ্য দিয়া গিয়া কবি একটি বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে উপাস্থত  
হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

সতী,

মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি !  
-তুমি যাহে দেখ পদ—  
সে যে ফুল কোকনদ !  
সে নহে শশান-চুল্লী— ভীষণ-হ্রস্বতি।

বলিতেছেন,

তাজিয়াছ মর্ত্যভূমি,  
তবু আছ— আছ তুমি !  
তুমি নাই— কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস।

তার পর দেবতাকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন,

ভাঙিতে গড় নি প্রেম, ওহে প্রেমময় !  
মরণে নহি তো ভিন্ন,  
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন—  
স্বর্গে মর্ত্যে বেঁধে রেছ সষক অক্ষয় !

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

লেখক মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষের অহুরোধে অক্ষয়কুমার বড়ালের প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনায  
ব্যাপ্ত ছিলেন— সম্ভবতঃ আলোচনাটি পূর্ণতর কবিবার অভিশ্রায় তাঁহার ছিল ; কিন্তু কাল সে  
অভিলাষ পূর্ণ হইতে দিল না, তাঁহার রচনা প্রকাশের সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যুসংবাদও (২৭ আষাঢ় ১৩৬৭)  
বিজ্ঞাপিত করিতে হইল। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ নানাভাবে বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন,  
এক সময়ে তিনি পত্রিকাধ্যক্ষপদেও বৃত্ত হইয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার বড়ালের স্মৃতিসভায় কবিতা-  
পাঠেই পরিষদের সহিত তাঁহার শেষ প্রত্যক্ষযোগ— সুদীর্ঘকাল তিনি পরিষদের যে সেবা  
করিয়া গিয়াছেন, এই প্রবন্ধ তাহার শেষ নিদর্শন হইয়া রহিল।

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সভা

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১২ চৈত্র ১৩৬৬ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় অক্ষয়কুমারের কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনা, ও তাঁহার রচিত কবিতা পাঠ হয়। এই আলোচনা ও পাঠে যোগ দিয়াছিলেন শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীত্রিপুরাশংকর সেন, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীস্বয়ংদীপ সাহা, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সভাপতি মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে বলেন,

“অক্ষয়কুমার সাধক ও ভক্ত। তাঁহার কবিতায় নারী ভোগের উপাদান নহে। কবি নারীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানসপুষ্প অর্ঘ্য দিয়াছেন। তাঁহার প্রেমের কবিতাগুলি শুচিতায় ভরপূব। তাঁহার কবিতা মানবিকতায় পূর্ণ। সমবেদনায় সমৃদ্ধ বলিয়াই তিনি বর্তমানকালের বহু হীনতা ও দীনতা অতিক্রম করিয়া সর্বত্র বক্তিতকে অনুভব করিয়াছেন।”

সভাপতি মহাশয় এই অনুষ্ঠান-প্রসঙ্গে বলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ধনী নহেন, তবু দেশবাসী যে-সব কবিকে ভুলিতে বসিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যকীর্তিগুলিকে রক্ষা করিয়াছেন বা করিতেছেন।—

এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কয়েক বৎসর পূর্বে অক্ষয়কুমার বড়ালের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থাবলীর ‘বিবিধ’-ভাগে, ‘গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবির বহু কবিতা এবং দুইটি পাণ্ডুলিপি-স্বাতন্ত্র্য বহু কবিতা স্থান পাইয়াছে।’

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক

# হিন্দী ভাষার কথা

পূর্বাহ্নবস্তি

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

খড়ীবোলী হিন্দীকে সাহিত্যে প্রয়োগের প্রথম কৃতিত্ব অবশ্য উত্তর ভারতের অমীর খুসরোই ( ১২৫৩-১৩২৫ ) দাবি করিতে পারেন। মূলতঃ ফার্সীর লেখক হইলেও খুসরো খড়ীবোলী হিন্দীর প্রথম কবি। পঞ্চদশ শতাব্দীর সম্ভ্ কবি কবীরদাসের রচনাতেও ভোজপুরী, অরধী প্রভৃতি ভাষার সহিত খড়ীবোলীর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খড়ীবোলী হিন্দীতে ধারাবাহিক রচনার সূত্রপাত ঘটে ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে— দক্ষিণের মুসলমান কবিদের হাতে।

তখনও উত্তর ভারতের মুসলমানদের বোলচালের ভাষা হিন্দী হইলেও তাঁহাদের কাব্য-রচনার ভাষা ছিল প্রধানতঃ ফার্সী। তাই তাঁহারা দক্ষিণী মুসলমানদের সাহিত্য-চর্চার এই নতুন মিশ্রভাষা রেখ্তাকে দক্ষিণী হিন্দী বা সংক্ষেপে দক্ষিণী বা দখনী বলিতে থাকেন। দখনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে আরবী-ফার্সীর মিশ্রণ থাকিলেও তাহার পরিমাণ ছিল অল্প।<sup>৪৬</sup> এক-শতাব্দী-ব্যাপী অহুঙ্কলনের ফলে রেখ্তা বা দখনী হিন্দীর সাহিত্যিক রূপে একটা বিশেষ উৎকর্ষ দেখা দেয় এবং সপ্তদশ শতকের শেষভাগে আমরা পাই রেখ্তার শ্রেষ্ঠ কবি বলী ঔরঙ্গাবাদীকে ( ১৬৬৮-১৭৭৪ )।<sup>৪৭</sup>

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বলী-র ঔরঙ্গাবাদ হইতে দিল্লী আগমনের ফলে উত্তর ভারতের সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। দিল্লী-অঞ্চলের সাহিত্যচর্চায় ফার্সীর স্থানে ধীরে ধীরে হিন্দীকে স্বীকার করা হইতে থাকে। বলী-ই ইহার পথপ্রদর্শক। কিন্তু দক্ষিণী মুসলমানদের সাহিত্যিক ভাষা হইতে উত্তরী মুসলমানদের সাহিত্যিক ভাষায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা দিল— তাহা হইল আরবী-ফার্সীর মিশ্রণ। স্বয়ং বলী ফার্সীর সূফী কবি শাহ সাহুজা

৪৬. শিতিকর্ষ মিশ্র, খড়ীবোলীকা আন্দোলন. পৃ ৩৩

Dakhini is the form of Hindostani used by Musalmans in the Deccan. Like Urdu, it is written in the Persian Character, but is much more free from Persianization.—L. S. I. Vol. I, Pt. I, p. 165.

৪৭. Its ( referring to Rekhta ) cultivation began in the Deccan at the end of the sixteenth century and it received a definite standard of form a hundred years later principally at the hand of Wali of Aurangabad, commonly called 'the Father of Rekhta'.—L. S. I. Vol. I, Pt. I, p. 167.

শুলগনের পরামর্শে বোলচালের ভাষা ছাড়িয়া ফার্সীময় হিন্দীতে কাব্যরচনার স্বত্রপাত করেন।<sup>৪৮</sup> দক্ষিণী মুসলমানরা নিজেদের ‘দখনী’ হইতে উত্তর ভারতের মুসলমানদের সাহিত্যিক ভাষার পার্থক্য বুঝাইবার জন্ত ইহার নামকরণ করে উত্তর ভারত বা হিন্দুস্তানের ভাষা অর্থাৎ হিন্দুস্তানী। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি উত্তর ভারতে এই ‘হিন্দুস্তানী’ নামটির প্রচলন হইতে থাকে।<sup>৪৯</sup> ঔরঙ্গাবাদের বলীকে রেখতার জনক না বলিয়া এই হিন্দুস্তানীর (মাহার পরিণত রূপ উর্দু) জনক বলাই সমীচীন। বলীর দিল্লী আগমনের পরে অষ্টাদশ শতকের গোড়া হইতেই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্তানী বা উর্দুর সাহিত্য-পরম্পরার সৃষ্টি হয়। সৌদা ও মৌরতকী বস্তুতঃ বলী-প্রবর্তিত কাব্যধারারই বাহক। এই ভাবে দিল্লী-অঞ্চলের কথ্যভাষা খড়ীবোলী হিন্দী নানা অবস্থার মধ্য দিয়া রেখতা, দখনী, হিন্দুস্তানী এবং পরিশেষে উর্দু নাম লইয়া সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।<sup>৫০</sup>

উত্তর ভারতের হিন্দুরা তখনও এই নবজাগ্রত ভাষা সম্পর্কে এক রকম উদাসীনই ছিলেন বলা যায়। তাঁহাদের সাহিত্যচর্চায় তখন অরবী এবং বিশেষভাবে ব্রজভাষার জয়জয়কার। বোলচালের ভাষারূপে যথেষ্ট ব্যাপক ও প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও খড়ীবোলী যে হিন্দু কবিসমাজে ব্রজভাষার সম্মুখে সাহিত্যিক গৌরব লাভে বঞ্চিত রহিল, তাহার প্রধান কারণ উক্ত ভাষার সহিত বিদেশী বিধর্মী মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দৈনন্দিন কথাবার্তার ইহার ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু পবিত্র সাহিত্যিক ভাষারূপে ব্যবহার চলিতে পারে না। তখনকার হিন্দুদের মনোভাব ছিল—ন বদেৎ যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠগঠৈরপি। যাবনী ভাষা অর্থাৎ খড়ীবোলী হিন্দী, যাহা বোলচালের ভাষা হইতে ক্রমে রেখতা, দখনী, হিন্দুস্তানী ও উর্দুরূপে মুসলমানী সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। কেশব, ভূষণ প্রভৃতি ব্রজভাষার কবিগণ কেবল মুসলিম চরিত্রের মুখে স্বাভাবিকতা সৃষ্টির জন্ত এই ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন।<sup>৫১</sup>

৪৮. ব্রজব্রহ্ম দাস, খড়ীবোলী হিন্দী সাহিত্যিক ইতিহাস ( ১৯৪৫ ), ২য় সং, পৃ ১০৭

৪৯. S. K. Chatterjee, *Indo-Aryan Hindi*.

৫০. সাহিত্যিক উর্দুর উৎপত্তি ও শব্দটির ব্যবহার তেমন প্রাচীন নয়। ‘জবান-এ-উর্দু’ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের নাম। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত উর্দু ভাষা বা সাহিত্যের প্রচলন হয় নাই। Urdu form of Hindusthani was not in existence as a literary language prior to the end of seventeenth century—S. K. Chatterjee, *Indo-Aryan and Hindi*. p. 147। কেহ কেহ বলেন, উর্দু শব্দটির প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় উনিশ শতকের গোড়ায়। ব্রজভাষা বনাম খড়ীবোলী—কপিলদেব সিংহ। পৃ ৫৩) মূলে কথাটি ছিল তুর্কী ভাষার। তুর্কী ভাষার মূল ‘ওর্দু’ শব্দটি ফার্সী বানানে রূপ গ্রহণ করে ‘উর্দু’। ইহার মূল অর্থ শিবির, সর্দারের আশ্রয়স্থান। দ্রষ্টব্য S. K. Chatterjee, *Indo-Aryan Hindi*.

৫১. শিত্তিকণ্ঠ মিশ্র, খড়ীবোলীক আন্দোলন ( ১৯৫৬ ), পৃ ৫৬

কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন চলিল না। মুসলমান শাসকদের ক্রম-বর্ধমান রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আদালতী ভাষা ফার্সীর সহিত তাঁহাদের কথ্যভাষারও প্রসার ঘটিতে থাকে। মোগল-শাসনের পূর্বেই উহা দক্ষিণ ভারতের একাংশে ব্যাপক বিস্তারলাভ করে, এমন-কি সাহিত্যের ভাষারূপেও স্বীকৃত হয়। উত্তর ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ঘরোয়া ভাষারূপে ইহার ব্যবহার তো বহু পূর্ব হইতেই ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সাহিত্যক্ষেত্রেও ইহার প্রবেশাধিকার ঘটে। এদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরে দিল্লীর পরিবর্তে লক্ষ্ণৌ হইতে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের শহরগুলির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। ব্যবসায়ী ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর ভাষা পূর্বাঞ্চলেও বিস্তার লাভ করে। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগের হিন্দুদের ইহা একপ্রকার মাতৃভাষাই ছিল। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশের অধিবাসীরা— যাহারা ঘরে ব্রজ, বৃন্দলী, কনৌজী, অরধী-বা ভোজপুরী বলিত— এই ভাষার প্রতি তাহাদের প্রাণের টান ছিল একথা বলা যায় না। বরং তাহারা ইহার বিরুদ্ধে এক প্রকার বিজাতীয় মনোভাবই পোষণ করিত। কিন্তু ক্রমশই ঋড়ীবোলীর ক্রম-বর্ধমান প্রাধান্য ও প্রসারের ফলে ইহার প্রতি আর উদাসীন থাকা সম্ভব হইল না। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে সমগ্র উত্তর ভারতের নাগরিক জীবনে ঋড়ীবোলী দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাটে-বাজারে ও বহিজীবনের অগ্রাগ্র কাজ-কর্মে বোলচালের ভাষারূপে ঋড়ীবোলীরই ব্যবহার চলিতে থাকে। এইভাবে ইংরেজশাসনের সূচনাতে হিন্দী-অঞ্চলের অগ্রাগ্র উপভাষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া ঋড়ীবোলীই পুরোবর্তী হইয়া উঠে।<sup>১২</sup>

হিন্দী ভাষার ইতিহাসে ইহা একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। প্রাচীনকাল হইতেই উত্তর ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পশ্চিম অঞ্চলের ভাষাই অগ্রাগ্র অংশে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। বৈদিক ও সংস্কৃত দুই-ই ছিল পশ্চিমের ভাষা। মধ্যভারতীয় আৰ্যভাষার মধ্যে মথুরার শৌরসেনী প্রাকৃতই ছিল সর্বব্যাপী। কিন্তু এই ভাষাগুলির ব্যাপকতা কথ্যভাষা হিসাবে ততটা ছিল না, যতটা ছিল সাহিত্যিক ভাষারূপে। শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত ব্রজভাষা ও ঋড়ীবোলী দুই-ই পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী। উত্তর ভারতের সাহিত্যে এই দুইটি ভাষাই মুখ্য স্থানের অধিকারী— মধ্যযুগে ব্রজভাষা, আধুনিক যুগে

৫২. ‘ঋড়ীবোলী’ নামটিরও উৎপত্তি বোধ করি এই সময়ে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত লল্লুলালের “প্রেমসাগর” নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ‘ঋড়ীবোলী’ কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘ঋড়ীবোলী’র ব্যুৎপত্তি লইয়া নানারূপ মতভেদ থাকিলেও আমাদের মনে হয়, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ব্রজভাষা প্রভৃতির প্রভাব ক্ষয়িষ্ণু দেখিয়া এইগুলিকে পতিত ভাষা (Fallen speech) বা ঋড়ীবোলী এবং দিল্লীর ভাষাকে বর্ষিষ্ণু দেখিয়া ইহাকে Standing speech বা ঋড়ীবোলী বলা হইতে থাকে।

দ্রষ্টব্য ১. S. K. Chatterjee, *Indo-Aryan and Hindi*, ২. রামচন্দ্র স্ত্রী, হিন্দী সাহিত্যিকা ইতিহাস।

খড়ীবোলী। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রজভাষার পূর্ণ সমৃদ্ধি ও গৌরবের কালেও ব্রজভূমির বাহিরে উহা বোলচালের ভাষা হইতে পারে নাই। বাহিরের লোক এই ভাষায় কাব্যচর্চা করিত বটে, কিন্তু অস্বঃপ্রাপ্তীয় ভাষারূপে ইহার কখনই প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বস্তুতঃ, অরধী, বৃন্দলী, কনৌজীর গ্রাম ব্রজভাষাও একটি জনপদীয় ভাষা মাত্র। বিস্তীর্ণ হিন্দী-অঞ্চলের সেই এক্য-বিধায়ক ভাষা হইল খড়ীবোলী। হিন্দী-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভের পূর্বেই তাহা হিন্দী-জগতের Lingua Franca হইয়া দাঁড়াইল। চারিটি জিলার ভাষা চারিটি প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

অতঃপর সাহিত্যসৃষ্টির পর্ব। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত হইল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীতেও গল্প গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের উদ্ভোগ হইতে থাকে। হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রাইস্টের তত্বাবধানে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় আগ্রানিবাসী শুজরাতী ব্রাহ্মণ লল্লুলালের “প্রেমসাগর” এবং বিহারের অধিবাসী সদল মিশ্র লিখিত “নালিকেতোপাখ্যান।” বলা বাহুল্য, হিন্দীর এই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ দুখানির ভাষা দিল্লী-মেরঠ অঞ্চলের খড়ীবোলী। হিন্দুদের সাহিত্যরচনায় ব্রজভাষার পরিবর্তে খড়ীবোলীর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের নবযুগ সূচিত হইল।<sup>৭০</sup>

৭০. হিন্দী-সাহিত্যে খড়ীবোলীর প্রথম ব্যবহার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। খড়ীবোলীকে যে সাহিত্যিক রূপকে বলা হয় হিন্দী অথবা উন্নত হিন্দী (High Hindi), সে সম্পর্কে গ্রিয়ারসন বলিয়াছেন— It is of modern origin having been introduced under English influence at the commencement of the last century. Up till then, when a Hindu wrote Prose, he wrote in his own dialect, Awadhi, Bundeli, Brajabhasa, Vernacular Hindostani. Lallulal changed all this by writing Premsagar. (L. S. I. Vol. I, Pt. I, p. 166). এই উক্তি হইতে মনে হইতে পারে যে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের প্রেরণায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হইতেই খড়ীবোলী হিন্দী-গতের সৃষ্টি এবং লল্লুলালই হিন্দী-গতের জনক। কিন্তু রামচন্দ্র শুক্ল, শিতিকণ্ঠ মিশ্র প্রমুখ হিন্দী পণ্ডিতগণ এই মতকে প্রবলভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে লল্লুলালের আগেই ইংরেজদের প্রেরণা বা সাহায্য ব্যতীত খড়ীবোলী হিন্দী-গতের ব্যাপক চর্চা হইয়াছিল বলিয়াই উনিশ শতকের গোড়ায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ খড়ীবোলীকেই গতের ভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে রচিত বলিয়া যে-কয়েকখানি গল্প গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা যেমনি বিচ্ছিন্ন, তেমনি নগণ্য। কেবল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ বৎসর আগে মুনশী সদাসুখলাল এবং ইন্শা আল্লা খাঁ (জন্ম মূর্শিদাবাদ) রচিত দুখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় যাহাদের গল্প বিশুদ্ধ খড়ীবোলী। সুতরাং বলা যায়, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে চার ব্যক্তির হাতে খড়ীবোলী গতের চর্চা শুরু হয়— মুনশী সদাসুখলাল, ইন্শা আল্লা খাঁ, লল্লুলাল ও সদল মিশ্র।

হিন্দী সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু ভাষার সমস্তা মিটিল না। গল্পের ক্ষেত্রে খড়ীবোলীর প্রতিষ্ঠা হইলেও পণ্ডের ক্ষেত্রে তখনও ব্রজভাষার আধিপত্য। খড়ীবোলীর পক্ষে সেই অধিকার লাভ করা সহজ হইল না। তিন শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়াও যাহা কাব্যের ভাষারূপে চলিয়া আসিয়াছে, যাহার পদ-লালিত্য ও কোমল মাধুর্যে জনসাধারণ মুগ্ধ, সহসা তাহাকে কাব্যক্ষেত্রে হইতে হটাইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। ব্রজভাষায় গল্পের চর্চা হইয়াছিল সামান্যই, তাই ইংরেজ আমলে হিন্দী গল্প অল্পশীলনের জন্ত যখন খড়ীবোলী নির্বাচিত হইল তখন কোনো পক্ষ হইতেই আপত্তির কোনো কাণ দেখা যায় নাই। পণ্ডের মত গল্প অল্পশীলনেও যদি ব্রজভাষার ঐতিহ্য থাকিত, তবে উনিশ শতকের গোড়ায় হিন্দী গল্পের ভাষা লইয়া একটা বিহ্বল সমস্তার সৃষ্টি হইত। যত সহজে খড়ীবোলীকে গল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা গিয়াছে, ব্যাপাবটা অত সহজে নিষ্পন্ন হইত না। কিছুকাল নানারূপ বিচার-বিতর্কে কাটিয়া যাইত, কিছুকাল পাশাপাশি উভয় ভাষায় গল্পের চর্চা হইত। এই জন্তই উনিশ শতকের গোড়ায় গল্পের ক্ষেত্রে খড়ীবোলীর নির্বিবাদ প্রতিষ্ঠাকে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকার রামচন্দ্র গুপ্ত ভগবানের অল্পগ্রহ বলিয়া মনে করিয়াছেন।<sup>৫৪</sup>

ইহার পূর্বে প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া হিন্দী সাহিত্যে বৈভ-রাজ চলিতে থাকে— গল্পে খড়ীবোলী, পণ্ডে ব্রজভাষা। গল্পে ও পণ্ডে ভাষা-বিষয়ক এই পার্থক্য নানা অস্থবিধার সৃষ্টি করিল। পাঠ্যপুস্তকাদিতেও প্রবন্ধের ভাষা খড়ীবোলী, কবিতার ভাষা ব্রজভাষা। গল্প ও পণ্ডের ভাষায় এই আকাশ-পাতাল (জমীনের ঔর আসমানকা) পার্থক্য হওয়াতে ইহার অবমানকল্পে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অস্বত্ব হইল।<sup>৫৫</sup> কী ভাবে ব্রজভাষাকে স্থানচ্যুত করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় খড়ীবোলী হিন্দী সাহিত্যের গল্পে ও পণ্ডে একচ্ছত্র অধিকার লাভ করিল সে কথা পরে আলোচিত হইবে।

তাহার পূর্বে হিন্দীকে আর একটি গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হইতে হয়। তাহা হইল হিন্দী-উর্দু-বন্দ। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই দ্বন্দ্বের প্রশ্ন দেখা দেয় নাই, কারণ তখনও হিন্দুদের সাহিত্যচর্চার প্রধান ভাষা ব্রজভাষা এবং তখনও মুসলমান কবিদের হাতে খড়ীবোলী আরবী-ফার্সী কণ্ঠকিত হইয়া দুর্বোধ্য হইয়া উঠে নাই।<sup>৫৬</sup> উনিশ শতকের গোড়ায় খড়ীবোলী হিন্দু জনসাধারণের সাহিত্যিক গল্প ভাষারূপে গৃহীত হইলে এই দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে। হিন্দী ও উর্দু এই শব্দ-দুইটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহাই হোক না কেন, বর্তমানে ইহার দুইটি স্বতন্ত্র ভাষার অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অথচ দুইটি ভাষারই মূল্যবোধ দিল্লী-মেরঠ অঞ্চলের কথ্যভাষা খড়ীবোলী, যাহাকে গ্রিয়ারসন সাহেব বলিয়াছেন হিন্দুস্তানী। সাধারণ

৫৪. হিন্দীসাহিত্যকা ইতিহাস, পৃ ৪০৬

৫৫. শিতিকর্ষ মিশ্র, খড়ীবোলীকা আন্দোলন, আমুখ (ভূমিকা)

৫৬. কপিলদেব সিংহ, ব্রজভাষা বনাম খড়ীবোলী, পৃ ৫৮

বোলচালের হিন্দুস্তানীতে সংস্কৃত বা আরবী-ফার্সীর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প।<sup>৫৭</sup> মুসলমানদের হাতে যখন ইহা সাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হয়, তখনও ইহার মূল রূপটিই অল্পবিস্তর রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই সাহিত্যিক হিন্দুস্তানী মুসলমানীরূপ লইয়া অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় জবান্-এ-উর্দু নাম গ্রহণ করে।<sup>৫৮</sup> আবার ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় সেই খড়ীবোলী বা হিন্দুস্তানী বা ঠেঠ-হিন্দী হিন্দুদের হাতে সংস্কৃতময় রূপ লইয়া হিন্দী নামে পরিচিত হইতে থাকে। এইরূপে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কলিকাতার কোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে একই ভাষা দুই ভিন্ন সাহিত্যিক রূপে (হিন্দী ও উর্দু) দুই ভিন্ন লিপিতে (নাগরী ও ফারসী) মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে।<sup>৫৯</sup>

কিন্তু ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের কাজকর্ম ও আফিস-আদালতের ভাষারূপে ফার্সীর পবিবর্তে উর্দুর প্রচলন হইলে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যেব স্বাভাবিক বিকাশের পথ সংকুচিত হইয়া আসিল। নাগরী অক্ষরের মধ্য দিয়া তখন যে ভাষার প্রচলন হইতে লাগিল তাহাকে হিন্দী না বলিয়া উর্দু বলাই সংগত। কেবল মাঝে মাঝে ‘ধর্মাশ্রা’, ‘পরমেশ্বর’, ‘দয়্য’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়া হিন্দীর মানরক্ষার চেষ্টা করা হইত।<sup>৬০</sup> কেবল আদালত হইতেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্র হইতেও হিন্দীকে দূরে সরাইয়া রাখার আয়োজন চলিতে লাগিল। কিন্তু ইতিমধ্যে (১৮৫০ হইতে ১৮৭০) হিন্দীজগতে এমন-একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইল এবং হিন্দী সাহিত্যে এমন কয়েকজন লেখকের আবির্ভাব ঘটিল<sup>৬১</sup> যাহাতে হিন্দীর পক্ষে উর্দুর প্রভাব মুক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হইল। হিন্দী-উর্দুর বিবাদ ইহার পরেও চলিয়াছে, কিন্তু তাহা হিন্দীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে হিন্দী-উর্দুর সম্পর্ক বিচার করাটা অবাস্তব হইবে না আশা করি। খড়ীবোলীর একটি সাহিত্যিক রূপ উর্দু আর দ্বিতীয় সাহিত্যিক রূপ হিন্দী। স্মরণ্য জন্মেব

৫৭. সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী বর্জিত বিশুদ্ধ খড়ীবোলীকে ঠেঠ-হিন্দীও বলা হয়। “হিন্দী সাহিত্যকা বৃহৎ ইতিহাস” নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে হিন্দীর বিভিন্ন উপভাষার মধ্যে খড়ীবোলী বা হিন্দুস্তানীর পরিবর্তে ঠেঠ-হিন্দী কথাটিরই ব্যবহার করা হইয়াছে।

৫৮. Urdu is that form of Hindostani which is written in the Persian character, and which makes a free use of Persian (including Arabic) words in its vocabulary.—L. S. I. Vol. 1 Pt. 1 p. 164 (1926)

৫৯. Hindusthani came out into the modern world as a vehicle of prose in its twin forms.—S. K. Chatterjee, *Indo-Aryan and Hindi*.

৬০. রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দীসাহিত্যকা ইতিহাস, পৃ ৪৩১।

৬১. এই যুগের হিন্দী-হিঁতৈবী ও লেখকদের মধ্যে রাজা শিবপ্রসাদ, রাজা লক্ষণ সিংহ, নবীনচন্দ্র রায়, শঙ্করবাম, দয়ানন্দ, কেডারিক পিনকট ও সর্বশেষে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

দিক হইতে বলা যায় ইহারা দুই সহোদর ভগিনী। কেহ কেহ হিন্দী-উর্দুকে দুইটি ভিন্ন ভাষা না বলিয়া একই ভাষার দুই স্বতন্ত্র রচনাশৈলী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।<sup>১২</sup> বস্তুতঃ, এমন এক সময় ছিল যখন উর্দুকে হিন্দু-মুসলমানদের সম্মিলিত ভাষারূপে গ্রহণ করা সম্ভব হইত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উর্দু আরবী-ফার্সীর ছায়া হইয়া পড়ে এবং সিপাহী-বিদ্রোহের পবে হিন্দী-উর্দুর ব্যবধান আরও বাড়িয়া যায়।<sup>১৩</sup> আজ ইহাদের রূপগত পার্থক্য এত বেশি যে, এই দুইটিকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া গণ্য করাই সমীচীন।<sup>১৪</sup> আজ আর কোনো মতেই প্রসাদ ও পঙ্কজের ভাষাকে গালিব ও ইকবালের ভাষার সহিত এক দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব নয়।

১২. ক. উর্দু হিন্দীরই একটি শাখা মাত্র এবং হিন্দী বাক্যে আরবী-ফার্সীর প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করিলেই তাহা উর্দুতে পরিণত হয়। ব্রজব্রহ্ম দাস, খড়ীবোলী হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস (১৯৪৫), ২য় সং, পৃ ১২

খ. Urdu is a Hindi and an Aryan dialect. A variety no doubt it is, differing from the original in having a large admixture of foreign element, but still a variety of Hindi... Rajendralal Mitra, *Indo-Aryan*, 1881, Vol. II, p. 237

গ. হিন্দী ভাষার মুসলমানী রূপকেই উর্দু বলা যাইতে পারে। ইহাতে দেশীয় ও সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে প্রচুর আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার করা হয়।—S. K. Chatterjee, *Indo-Aryan and Hindi* (1942), p. 131

১৩. কপিলদেব সিংহ, ব্রজভাষা বনাম খড়ীবোলী, পৃ ৫৮

১৪. চারিটি প্রধান বিষয়ে হিন্দী এবং উর্দুর ভাষাগত পার্থক্য দেখা যায়—

ক. উর্দুতে আরবী-ফার্সী শব্দের বাহুল্য; তাহাও তদ্ভবরূপে নয়, তৎসমরূপে।

খ. উর্দুর উপর ফার্সী ব্যাকরণের প্রভাব, যাহার ফলে উর্দু বহুবচন হিন্দীর অনুরূপ না হইয়া ফার্সী অনুযায়ী হয়। যেমন, কাগজ—কাগজাত, কিতাব—কুতুব, বকীল—বকলা ইত্যাদি।

গ. সম্বন্ধ বুঝাইতে কা-কে-কীব পরিবর্তে 'এ'-র ব্যবহার। যেমন, হিন্দ কা সিতাবা (ভারত নক্ষত্র)—সিতারে হিন্দ; মকান কা মালিক—মালিকে মকান; চমন কা গুল (বাগানের ফুল)—গুলে চমন ইত্যাদি। করণে ও অপাদানে 'সে' চিহ্নের পরিবর্তে 'অজ'এর ব্যবহার। যেমন, কম সে কম—কম অজ কম। অধিকরণে 'দর', 'ফিল' ইত্যাদির প্রয়োগ। যেমন, দর-অসল (অসল য়ে), দরহকীকত (হকীকত য়ে), ফিল-হাল (হাল য়ে) ইত্যাদি।

ঘ. অদ্বয়গত পার্থক্য। শ্রীমহেন্দর দাস, হিন্দী ভাষাকা বিকাশ (১৯৫০), পৃ. ৮৩-৮৪

বেঙ্কটেশনারায়ণ তিবারী, হিন্দী বনাম উর্দু (১৯৩৯), পৃ ৩২-৪

হিন্দী-উর্দু পার্থক্য কেবল শব্দগত পার্থক্য এবং ব্যাকরণের খুঁটিনাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। এই দুই ভাষার সাহিত্য আঙ্গ দুইটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচায়ক এবং হিন্দী-উর্দু বিবাদের মধ্যে সেই সাংস্কৃতিক বিবাদই প্রকাশ হইয়া পড়ে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যদি সংস্কৃত ও আরবী-ফার্সীর মোহ ত্যাগ করিয়া ঠেঠ-হিন্দী বা হিন্দুস্তানী বা বিশুদ্ধ খড়ীবোলীর আশ্রয় গ্রহণ করিত, তবে কি হিন্দী-উর্দু সমস্তা মিটিয়া যাইত? ঠেঠ-হিন্দী কোনো উন্নত ভাষা নয়, ইহাতে উচ্চতর ভাব প্রকাশ কবিত্তে গেলে সংস্কৃতি-মূলক শব্দের জন্ত লেখককে তাঁহার জ্ঞান ও রুচি অল্পাংশী হয় সংস্কৃত নাহয় আরবী-ফার্সীর দ্বারস্থ হইতেই হইবে। হিন্দী-উর্দু জন্মও হইয়াছে এইভাবে।<sup>৬৫</sup> তাহাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের পদ্ধতি স্বতন্ত্র, তাহাদের সাহিত্যের ইতিহাসও পৃথক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে উর্দুর বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া হিন্দী গল্প তাহার নিজস্ব বিকাশের পথ খুঁজিয়া পাইল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজা লক্ষণ সিংহের ‘শকুন্তলা’ গ্রন্থের ভাষা যেমন বিশুদ্ধ, তেমনি সবস।<sup>৬৬</sup> ইহাতে খাঁটি সরল হিন্দীর সহিত সংস্কৃতের বহু-ব্যবহৃত রস-সিদ্ধ শব্দাবলীর সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এগারো বৎসর পরে ১৮৭৩ সালে<sup>৬৭</sup> এই ভাষাকেই আদর্শ করিয়া আধুনিক হিন্দী গল্পের প্রবর্তক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-১৮৮৫) তাঁহার ‘হরিশ্চন্দ্র-চন্দ্রিকা’ পত্রিকার মধ্য দিয়া জনসাধারণের সম্মুখে হিন্দী গল্পের পরিচ্ছন্ন রূপটি তুলিয়া ধরিলেন।

৬৫. খড়ীবোলী হিন্দীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি লাস্ত্র ধারণা এখনও প্রচলিত আছে। বোধ করি গ্রিয়াবসন ইহার জন্মদাতা। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন : It (Hindi or High Hindi or literary Hindi) is of modern origin having been introduced under English influence at the commencement of the last century (i. e. 19th. century).—L. S. I. Vol. I, pt. 1, p. 166

খড়ীবোলী হিন্দীর সাহিত্যিক রূপ খড়ীবোলী উর্দুর তুলনায় নিশ্চয়ই অর্বাচীন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরেজের প্রেরণায় ইহার উদ্ভব ঘটিয়াছে বলিলে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার অনেক কাল আগে হইতেই খড়ীবোলী হিন্দীতে গ্রন্থরচনা চলিয়া আসিয়াছে। পণ্ডিত কিশোরীদাস বাজপেয়ী তাঁহার “ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান” (১৯৫২) গ্রন্থে বলিয়াছেন—“উর্দু ভাষা হইতে অনাবশ্যক বিদেশী শব্দ বর্জন করিয়া ফার্সীর বদলে নাগরী লিপিতে লিখিয়া এবং বাক্যবিশ্বাসে আরবী-ফার্সী পদ্ধতি বর্জন করিয়া হিন্দীভাষা গঠিত হইল।” (পৃ. ১৫০)। বস্তুতঃ এই অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়। উর্দু হইতে কখনও হিন্দীর উৎপত্তি হয় নাই, বরং উর্দু নিজেই ঠেঠ হিন্দী বা খড়ীবোলীর কাঠামোর উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে মুসলমান উর্দু লেখকদের কৃতিত্ব এইটুকু যে, তাঁহাবাই সর্বপ্রথম খড়ীবোলীকে সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা দান করিয়াছেন।

৬৬. বিজ্ঞানাগরের ‘শকুন্তলা’ ১৮৫৪ সালে এবং ‘সীতাব বনবাস’ ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়।

৬৭. বঙ্কিমের ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে।

এইভাবে হিন্দী-গণ্ডে খড়ীবোলী সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও কাব্যের ক্ষেত্রে কিন্তু তখনও তাহার প্রবেশাধিকার হয় নাই। গণ্ডে ধাহারা খড়ীবোলীব সমর্থক, পণ্ডে তাঁহারাই ব্রজভাষার অমুরাগী। এমন-কি যিনি আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের জনক বলিয়া পরিচিত, সেই ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রও ( জীবৎকাল ১৮৫০-১৮৮৫ ) কাব্যের ক্ষেত্রে খড়ীবোলীর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ কবিতা ব্রজভাষায় লিখিত।<sup>৬৮</sup>

কাব্যে খড়ীবোলী ব্যবহারেব বিরুদ্ধে একটি প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, খড়ীবোলীর সংযুক্ত ক্রিয়াপদগুলিব রূপ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। ব্রজভাষা ও অবধীর হ্রস্ব ক্রিয়াপদের সাহায্যে যত সহজে কাব্যরস জন্মান যাইত, খড়ীবোলীতে সেই সুযোগ ছিল না।<sup>৬৯</sup> তা ছাড়া সাহিত্যের, বিশেষতঃ কাব্যের, চিত্রাচরিত ভাষাকে সহসা বর্জন করিয়া নূতন ভাষাকে স্বীকার করিয়া লওয়া বড় সহজ কথা নয়।

কিন্তু মুজফ্‌রপুরের অধিবাসী বাবু অমোধ্যাপ্রসাদ খজুরি নেতৃত্বে খড়ীবোলী-আন্দোলন ক্রমশই এমন শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল যে, তাহার প্রত্যেকে এড়াইয়া চলা আর সম্ভব হইল না। পাঠশালাব অল্পবয়স্ক বিদ্যার্থীর পক্ষেও হিন্দীশিক্ষার বিশেষ অসুবিধা ছিল এই যে, তাহাকে গণ্ডের জ্ঞান একটি এবং গণ্ডের জ্ঞান আর একটি ভাষা শিখিতে হইত।<sup>৭০</sup> হিন্দী-উর্দু প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই উর্দুবাদীরা অন্তান্ত কথার সঙ্গে ইহাও বলিতেন যে, উর্দুতে গণ্ড ও গণ্ডের ভাষা একই, হিন্দী এখনও সেই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই।<sup>৭১</sup> এই সকল কারণে হিন্দী সাহিত্যের অভ্যন্তরে ব্রজভাষা ও খড়ীবোলীর ঝগড়া প্রবল হইয়া উঠিল।<sup>৭২</sup>

৬৮. ভারতেন্দু গুণর্শলীব ন্যায় কাব্যেব ভাষা ব্রজভাষাকেও মার্জিত কবেন। ব্রজভাষার কাব্যে এমন সব পদের ব্যবহার হইতেছিল, যাহা ব্রজভূমির কথা ভাষায় বহুদিন যাবৎ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে কাব্যের ভাষা জনসাধারণের ভাষা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়ে। এই সকল ক্ষেত্রে ভারতেন্দু অনেক সংস্কার সাধন করেন।

৬৯. শিতিকণ্ঠ মিশ্র, খড়ীবোলীকা আন্দোলন, পৃ. ২৭

৭০. ব্রজভাষা-অমুরাগীদের পক্ষ হইতে এই মতও প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, গণ্ডে ও গণ্ডেব ভাষা পৃথক হওয়া কিছু অগৌরবের নয়। সংস্কৃত নাটকে যেমন প্রাকৃতও আছে, তেমনি হিন্দী-সাহিত্যে গণ্ডে খড়ীবোলী ও গণ্ডে ব্রজভাষা চলিবে। শিতিকণ্ঠ মিশ্র। খড়ীবোলীকা আন্দোলন, পৃ. ১৭৬

৭১. কপিলদেব সিংহ, ব্রজভাষা বনাম খড়ীবোলী, পৃ. ২২

৭২. ব্রজভাষা-খড়ীবোলী-বিতর্কের একটি ফল হইল এই যে, হিন্দীর আধুনিক কবিরা ব্রজভাষার প্রতি উদাসীন হইয়া থাকিলেন। এবং তাঁহাদের শ্রাব্যবলী ব্রজভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত হইতে গৃহীত। ইহাতে ভাষা যেমন দুর্বল, তেমনি রসহীন হইয়া পড়ে। এই দুর্গুণতা কেবল হিন্দী পণ্ডেই নয়, হিন্দী গণ্ডেও রহিয়াছে। কপিলদেব সিংহ লিখিত “ব্রজভাষা বনাম খড়ীবোলী”র ভূমিকায় রামবিলাস শর্মা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের জীবৎকাল (মৃত্যু ১৮৮৫) পর্যন্ত হিন্দী কাব্যের ক্ষেত্রে ব্রজভাষার পূর্ণ আধিপত্য। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইল খড়ীবোলী হিন্দীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ শ্রীধর পাঠক রচিত “একান্তবাসী যোগী”। খড়ীবোলী হিন্দীর অগ্রতর প্রথম কবি অযোধ্যা-সিংহ উপাধ্যায়—যিনি ‘হরিশ্চন্দ্র’ নামে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। ইহারা খড়ীবোলীর সঙ্গে ব্রজভাষাতেও কাব্যরচনা করেন। মোট কথা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দী-কাব্যের ক্ষেত্রে ব্রজভাষা ও খড়ীবোলী বশস্তি সমান-সমান—ব্রজভাষা ক্ষয়িষ্ণু, খড়ীবোলী বর্ধিষ্ণু।

বিশ্বয়েব বিষয় এই যে, গ্রিয়ারসনের গ্রন্থ ভারতীয় ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও খড়ীবোলীর প্রবল শক্তির কথা অনুধাবন করেতে পারেন নাই। সমসাময়িক কাব্যচর্চা সম্পর্কে তাঁহার এই উক্তি লক্ষণীয় : Of late some attempts have been made to write poetry in literary Hindi (i.e. Khariboli Hindi), but I do not think that such attempts can have more than a small modicum of success. (L. S. I. Vol. I. Pt. I p. 166)। গ্রিয়ারসনের এই অভিমত কতদূর সত্য তাহা হিন্দী-কাব্য-রসিকদের বিচার্য।<sup>১৩</sup>

উনিশ শতকের অন্তিম ভাগ এইরূপ বাদবিবাদেই কাটিয়া গেল। বিংশ শতকের গোড়াতেই (1903) প্রকাশিত হইল মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর সম্পাদনায় হিন্দীর সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র “সরস্বতী” এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকার মধ্য দিয়াই আবির্ভূত হইলেন মাইকেল মধুসূদনের হিন্দী অনুবাদকার খড়ীবোলীর প্রতিনিধি কবি মৈথিলীশরণ শুক্ল। শুক্লজীর আবির্ভাবে হিন্দী কাব্যে ব্রজভাষার পরিবর্তে খড়ীবোলীর স্থান স্থানান্তরিত হইয়া গেল।

হাজার বছর আগে পিঙ্গল ভাষার মধ্য দিয়া যে হিন্দী সাহিত্যেব সংকোচ স্থচনা, মধ্যযুগে অরবী ও ব্রজভাষায় বাহার বিকাশ ও পরিপুষ্টি, উনিশ শতকে বাহার গম্ভ ও পশ্চ রচনা যথাক্রমে খড়ীবোলী ও ব্রজভাষার মধ্য দিয়া প্রচারিত, বিংশ শতকে একমাত্র খড়ীবোলীকেই বাহার কাব্যসরস্বতীর বাহনরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, মোটামুটিরূপে সেই হিন্দী সাহিত্যের ভাষাগত বৈচিত্র্য ও জটিলতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। খড়ীবোলী হিন্দী অদ্ভুত শক্তিশালিনী ভাষা। অনেক সংঘর্ষ ও বাদবিবাদের পরে ইহাব প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ‘নবীন ভাষা’ ভাবতবর্ষে প্রধান অংশের সাহিত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাষারূপে দাঁড়াইয়া গেল।

৭৩. অযোধ্যাপ্রসাদ খড়ী তাঁহার “খড়ীবোলী কা পদ্য” (১৮৮৮) সংকলন-গ্রন্থখানি উৎসাহের সহিত গ্রিয়ারসনের মতামতের জন্ত পাঠাইলে এইরূপ উত্তর পাইলেন : I have received a copy of your Khariboli ka padya and your letter asking for an opinion of it. I regret no criticism of mine can be of use to you, as I am strongly of opinion that all attempts at writing poetry in Khariboli must be unsuccessful.—খড়ীবোলীকা আন্দোলন, পৃ. ১৮৮

হিন্দী ভাষার ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রও প্রসারিত হইয়াছে। পূর্বা হিন্দী ও পশ্চিমা হিন্দীর অতিরিক্ত ভোজপুরীকেও হিন্দীর উপভাষারূপে গণ্য করার ফলে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল এবং বিহারের পশ্চিমাঞ্চল স্বভাবতই হিন্দী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। বিহারের নিজস্ব ভাষা মৈথিলী ও মগহীকে হিন্দীর উপভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায় কি না সে সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে,<sup>৭৪</sup> কিন্তু বিহারের অধিবাসিগণ বাংলা অপেক্ষা হিন্দী অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক।<sup>৭৫</sup> এবং বর্তমানে বিহারীদের শিক্ষা ও সাহিত্যের ভাষা হিন্দীই। রাজস্থান সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। কোনো কোনো হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকার (রামকুমার বর্মা, হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস) রাজস্থানী ভাষাগুলিকে হিন্দীর উপভাষা ধরিয়া লইয়া প্রাচীন ডিঙ্গল (রাজস্থানী) সাহিত্যকে হিন্দী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এমন-কি রাজস্থানের সুপণ্ডিত সাহিত্যসেবী শ্রীমোতীলাল মেনারিয়া তাঁহার “রাজস্থানী ভাষা ওর-সাহিত্য” (১৯৫১) গ্রন্থের “নিবেদন”এ রাজস্থানী ও হিন্দীর পার্থক্য স্বীকার করিয়াও বলিয়াছেন যে, হিন্দী কোনো একটি ভাষা নয়, খড়ীবোলী-ব্রজ-অবধী-ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষার সমুদায়। উহার মধ্যে রাজস্থানীকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রাচীন সাহিত্য সম্বলিত বিহারী ও রাজস্থানী ভাষা যেখানে

৭৪. মিথিলার কবি বিজ্ঞাপতির উপর বাঙালীর খানিকটা দাবী আছে। গ্রিয়ারসন সাহেবও মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত মগহী ও মৈথিলীকে শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হিন্দী হইতে পৃথক বলিয়া মনে কবেন। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যেব প্রবীন পণ্ডিত রামচন্দ্র শুল্কের অভিমত অন্তরূপ। তাঁহার মতে কেবল ভাষাশাস্ত্রের দৃষ্টিতে কিছু প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া সাহিত্য সামগ্রীর বিচার হইতে পারে না। ইহার সঙ্গে আবও একটি বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক। তাহা হইল ভাষার বোধগম্যতা। কোন ভাষা কোথায় কতদূর বোঝা যায়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার শ্রেণীবিভাগ করা উচিত। হিন্দীর বিভিন্ন উপভাষার মধ্যে রূপ-গত ও প্রত্যয়-জনিত প্রচুর পার্থক্য সত্ত্বেও তাহাবা একই হিন্দীভাষার অন্তর্গত। ইহার যে কোনো একটি ভাষাভাষী অপর ভাষাকে সহজেই বুঝিতে পারে। বেনারস, গাজীপুর, পোরখপুর, বালিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে ‘আয়ল—আইল’, ‘গয়ল—গইল’, ‘হমরা—তোহরা’ প্রভৃতি পদের প্রচলন সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলের ভাষা হিন্দী ছাড়া কিছু নয়। ইহার কারণ শব্দাবলীর (vocabulary) ঐক্য। সুতরাং যে কারণে নরপতি নাল্হ রচিত “বীসলদের রাসো” হিন্দী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, ঠিক সেই কারণে বিজ্ঞাপতির পদাবলীও। হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস, পৃ ৫৭

৭৫. It is true that the nationalities who speak Bihari are historically connected with the united provinces and not with Bengal. All their family ties, all their traditions, point to the west and not to the East. L. S. I. Vol I, pt. II, p. I



হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেখানে সাহিত্যসম্পদহীন পাহাড়ী ভাষাগুলির স্বতন্ত্র্যক্ষার প্রায়ই উঠে না। মোট কথা, আজ হিন্দী ভাষার ক্ষেত্র পশ্চিমে পঞ্জাব হইতে পূর্বে বাংলা দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।<sup>১৬</sup> এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পনেরো কোটি অধিবাসী হিন্দীভাষী বলিয়া পরিচিত।

পরিশেষে হিন্দী জগতে সাহিত্যিক হিন্দী (অর্থাৎ খড়ীবোলী) এবং তাহার বিভিন্ন উপভাষার স্থান সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা আবশ্যিক। ইহা সত্য যে, আজ বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে হিন্দী ভাষার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। হিন্দীর অধিকাংশ লেখকেরই মাতৃভাষা হিন্দী নয়; ব্রজ, অবধী, ভোজপুরী, মৈথিলী প্রভৃতি তাঁহাদের নিজস্ব ভাষা।<sup>১৭</sup> স্বভাবতই খড়ীবোলীর প্রভাবে এই ভাষাগুলি উপেক্ষিত হইতেছে।

সম্প্রতি একটি নূতন আন্দোলন দেখা দিয়াছে যাহাতে হিন্দীকে অন্তঃপ্রান্তীয় ভাষারূপে স্বীকার করিয়াও বিভিন্ন জনপদের ভাষায় সাহিত্য রচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।<sup>১৮</sup> এই আন্দোলন সাধাবণতঃ 'জনপদী আন্দোলন' নামে পরিচিত। এই

১৬. ক. Europeans use the word (Hindi)...sometimes to indicate all the rural dialects spoken between Bengal proper and the Panjab. L. S. I. Vol. 1, pt. 1, p. 166

খ. হিন্দীভাষার ক্ষেত্র পশ্চিমে জৈসলমীর, উত্তর-পশ্চিমে আধালা, উত্তরে শিমলা হইতে নেপালের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলের দক্ষিণাংশ, পূর্বে ভাগলপুর, দক্ষিণ-পূর্বে রায়পুর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে খাণ্ডুয়া। ধীরেন্দ্র বর্মা, হিন্দীভাষা ঔর লিপি। পৃ ৪০

গ. "আমরা হিন্দী বলিতে হিন্দীর সব উপভাষাকেই বুঝিয়া থাকি। হিন্দীর উপভাষা লইয়া একটি হিন্দী ভাষা-সংঘ বা হিন্দী কমন্‌ওয়েলথ গঠিত হইয়াছে। এই ভাষা-সংঘের উপভাষাগুলির বিধি-বিধান আলাদা, ব্যাকরণ ভিন্ন। তথাপি বিভিন্ন উপভাষার বিস্তৃত অঞ্চলকে যে হিন্দী ক্ষেত্র বলা হয় তাহার কারণ এই সমস্ত প্রদেশে হিন্দী মাতৃভাষার স্ফায়ী বোকা যায়।" কিশোরীদাস রাজপেয়ী, ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান (১৯৫২), পৃ. ১৬২-১৭১

১৭. মাতৃভাষার তাৎপর্য এই যে, অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তি এবং শিশুও তাহার ব্যাকরণের মৌলিক ভুল করিবে না। যে শিশু ব্যাকরণের নাম পর্যন্ত শোনে নাই, সেও অন্তর্ভুক্ত কথা শুনিতে হাসিয়া উঠিবে। মাতৃসুষ্ঠু গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শিশু বিনা চেষ্টায় তাহার মাতৃভাষা ও সেই ভাষার ব্যাকরণ শিখিয়া থাকে। ব্রজ প্রভৃতি ভাষাকে হিন্দীর সহিত এক করিয়া দেখা যাইতে পারে না। রাহুল সাংকৃত্যায়ন, আজকী সমস্তা (১৯৪৫)। পৃ. ৩০

১৮. "হিন্দীকে আমরা অন্তঃপ্রান্তীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতে পারি, মাতৃভাষারূপে নয়। কাহারও মাতৃভাষা বধ করিয়া হিন্দীর পুতনা হইবার অধিকার নাই।" রাহুল সাংকৃত্যায়ন, আজকী সমস্তা (১৯৪৫)। পৃ. ৪০

আন্দোলনের উত্তোক্তারা কামনা করেন যে, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ভাষীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে (যেমন অবধী, ব্রজভূমিতে ব্রজভাষা ইত্যাদি) স্বীকৃতি লাভ করিবে এবং এই সমস্ত ভাষার স্বতন্ত্র বিকাশের পথ প্রশস্ত হইবে।<sup>১২</sup> যাহারা খড়ীবোলীর প্রচার ও প্রভাব দেখিয়া মনে করেন যে হিন্দীর অন্তান্ত উপভাষা মৃত অথবা নিশ্চাণ অথবা সাহিত্য রচনার অল্পপযোগী, তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ব্রজভাষা, অবধী, রাজস্থানী, ভোজপুরী, বৃন্দেলী, মগহী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষা, যাহা কোটি কোটি লোকের মাতৃভাষা এবং যাহা ভূমির সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাহাদের জীবিত থাকা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। এমন-কি খড়ীবোলীর পাশাপাশি এই সমস্ত ভাষায় কিছু-না-কিছু সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে। অবধীর কাব্যধারা আজও প্রবাহিত। গত হুড়ি বৎসরের মধ্যে অবধী ভাষায় অনেক লেখক-লেখিকার সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে বলভদ্র দীক্ষিত ‘পটীস’ বর্তমান অবধীর যুগপ্রবর্তক কবিরূপে সম্মানিত।<sup>১৩</sup> ভোজপুরী অঞ্চলের অনেক কবি তাহাদের হৃদয়ের কথা ও গভীর অল্পভূতি ভোজপুরী ভাষার মধ্য দিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ ভোজপুরী নাটক “বিন্দেসিয়া”র লেখক ভিখারী ঠাকুরের কথা ভোজপুরী ক্ষেত্রের বাহিরেও প্রসারিত।<sup>১৪</sup> মৈথিলীতে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হইতেছে। মনোমোহন ঝা-রচিত মৈথিলী ছোটগল্প হিন্দীতে অনূদিত হইয়া সম্মান লাভ করিয়াছে। এমন-কি পশ্চাৎপদ বৃন্দেলীতেও সাহিত্য-রচনার কাজ অগ্রসর হইতেছে।<sup>১৫</sup> আর ব্রজভাষার তো কথাই নাই।<sup>১৬</sup>

জনপদী ভাষার সমর্থনে এত কথা বলিবার পরেও মনে হয় যে, বৃহত্তর হিন্দী ভূগতে খড়ীবোলী আজ এমন-একটা স্থায়ী ও দৃঢ় আসন লাভ করিয়াছে যাহা ‘জনপদী’-রও অস্বীকার করিতে পারেন না। এই দৃঢ়মূল খড়ীবোলীর বিরুদ্ধে জনপদী আন্দোলন ধীরে

১২. শমসের সিংহ নরুলা। হিন্দী ঔর প্রাদেশিক ভাষাওঁকা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, (১৯৫৭), পৃ. ১৩৬

১৩. জিলোকীনারায়ণ দীক্ষিত। অবধী ঔর উসকা সাহিত্য (১৯৫৪), পৃ. ৮২

১৪. উদয়নাথায়ণ তিয়ারী। ভোজপুরী ভাষা ঔর সাহিত্য, পৃ. ৪০

১৫. নরুলা। হিন্দী ঔর প্রাদেশিক ভাষাওঁকা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, পৃ. ১০৫-১৩৬

১৬. রামচন্দ্র শুল্ক তাহার “বুদ্ধচরিত” (১৯৩৮) নামক কাব্যগ্রন্থের “কাব্যভাষা” সম্পর্কে আলোচনার শেষে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য করিয়াছেন। “রাজা লক্ষ্মণ সিংহ কৃত ব্রজ ভাষায় মেঘদূতের অল্পবাদ এবং শ্রীধর পাঠকের ‘ঋতুসংহার’ অল্পবাদ পাঠের পরেও কেহ কি বলিবেন যে ব্রজভাষা জীবিত নয়, মৃত?”

ব্রজভাষী পণ্ডিত সত্যেন্দ্র বলিয়াছেন: “কিছু কিছু লোকের ধারণা যে ব্রজভাষা সাহিত্য স্বীয় গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া হীন অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু ব্রজভাষা স্বরদাসের সময়ে যেমন ছিল, আজও তেমনি জীবন্ত। আজও এই ভাষা ভাবপ্রকাশে ততই শক্তিশালী।”—হিন্দী কী প্রাদেশিক বোলিয়া, ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।

ধীরে স্থিতিত হইয়া আসিতেছে। আজ যাহারা আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য-রচনায় অগ্রসর, খড়ীবোলীর লেখক-সংখ্যার তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয় ও নগণ্য। এই সমস্ত ভাষায় লোকসাহিত্যের সৃষ্টি অব্যাহত থাকিলেও উন্নত সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে খড়ীবোলীর প্রাধান্য অবিসংবাদিত।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, খড়ীবোলী হিন্দী সাহিত্যিক দৃষ্টিতে যতই শক্তিশালী হউক না কেন, তাহা কখনই হিন্দীর অগ্রাগ্র উপভাষাগুলির স্থান গ্রহণ করিতে পারিবে না। হিন্দী ভাষার ক্ষেত্রে এত বিস্তৃত এবং ইহার ঐক্যবিধায়ক শক্তি এত দুর্বল যে, ব্রজ, অৱধী বা হিন্দীর অগ্র কোনো উপভাষা নষ্ট হইবে এ কথা কল্পনা করা যায় না। খুবই সম্ভব যে বিভিন্ন উপভাষার শব্দ-সম্পদ খড়ীবোলীকে প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট করিবে এবং খড়ীবোলীও ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে।

বদ্বাদী কলেজ, কলিকাতা

### সহায়ক গ্রন্থসূচী

তারকাচিহ্নিত গ্রন্থগুলি হইতে বিশেষ সাহায্য লওয়া হইয়াছে

১. *Indo-Aryans*, vol. ii, Rajendralal Mitra, 1881
২. *Linguistic Survey of India*, vol. v, pt. ii, 1903
৩. *Linguistic Survey of India*, vol. vi, 1903
- \*৪. *Linguistic Survey of India*, vol. i, pt. i, 1926
- \*৫. ব্রজভাষা ব্যাকরণ, ধীরেন্দ্র বর্মা, 1937
৬. *Evolution of Awadhi*, Baburam Saksena, 1938
৭. বৃদ্ধচরিত, রামচন্দ্র গুপ্ত, 1938
৮. হিন্দী বনাম উর্দু, বেঙ্কটেশনারায়ণ তিৱারী, 1939
- \*৯. হিন্দী ভাষা ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, ধীরেন্দ্র বর্মা, 1940
১০. বিহারী ভাষা কী উৎপত্তি ওর বিকাশ, নলিনীমোহন সান্দ্রাল, 1942
- \*১১. *Indo-Aryan and Hindi*, S. K. Chatterjee, 1942
- \*১২. ভারতের ভাষা ও ভাষাসম্রাজ্ঞা, শ্রীহীনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 1944
- \*১৩. আজকালী সম্রাজ্ঞা, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, 1945
- \*১৪. খড়ীবোলী হিন্দী সাহিত্য ইতিহাস, ব্রজেন দাস, 1945
- \*১৫. হিন্দী ভাষা ওর লিপি, ৩য় সং, ধীরেন্দ্র বর্মা, 1949
১৬. *A History of Maithili Literature*, vol. i, Jaykanta Mishra, 1949
- \*১৭. হিন্দী ভাষা বিকাশ, শ্রীমহেন্দ্র দাস, 1950
- \*১৮. রাজস্থানী ভাষা ওর সাহিত্য, মোতীলাল মেনারিয়া, 1951

- \*১৯ হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস, ৭ম সং, রামচন্দ্র শুক্ল, 1951
- ২০ চন্দ্র বরদাসী ওর উনকা কাব্য, বিপিনবিহারী ত্রিবেদী, 1952
- ২১ সংক্ষিপ্ত পৃথ্বীরাজ রাসো, হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও নামদর সিংহ সম্পাদিত, 1952
- \*২২ ভোজপুরী ভাষা ওর সাহিত্য, উদয়নারায়ণ তিবারী, 1954
- \*২৩ ব্রজভাষা, ধীরেন্দ্র বর্মণ, 1954
- \*২৪ হিন্দী সাহিত্যের আলোচনাত্মক ইতিহাস, ৩য় সং, রামকুমার বর্মণ, 1954
- \*২৫ অরধী ওর উনকা সাহিত্য, ত্রিলোকীনারায়ণ দীক্ষিত, 1954
- ২৬ কবিতা কোমুদী, অষ্টম সং, পহলা ভাগ, রাম নরেশ ত্রিপাঠী সম্পাদিত, 1954
- \*২৭ হিন্দী ভাষার উদ্গম ওর বিকাশ, উদয়নারায়ণ তিবারী, 1955
- \*২৮ খড়ীবোলীক আন্দোলন, শিতিকর্ষ মিশ্র, 1956
- \*২৯ ব্রজভাষা বনাম খড়ীবোলী, কপিলদেব সিংহ, 1956
- ৩০ হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম ভাগ, নাগরী প্রচারিত্রী সভা, 1957
- ৩১ হিন্দী ওর প্রাদেশিক ভাষাগুলোর বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, শমসের সিং নক্সলা, 1957
- ৩২ সূর্যপূর্ব ব্রজভাষা ওর উনকা সাহিত্য, শিবপ্রসাদ সিংহ, 1958
- ৩৩ হিন্দী সাহিত্যকোষ, 1958
- ৩৪ ভারতীয় ভাষা বিজ্ঞান, কিশোরীদাস বাজপেয়ী, 1959
- ৩৫ দ্বিবেদী-অভিনন্দন গ্রন্থ, ?
- ৩৬ হিন্দী কী প্রাদেশিক বোলিয়া, ভারত সরকার, ?

## কাশীৰাম কি সমগ্ৰ বনপৰ্বৰ ৰচয়িতা ?

শ্ৰীঅক্ষয়কুমাৰ কয়াল

প্ৰায় এক শত বৎসৰ পূৰ্বে 'অষ্টাদশ পৰ্ব অমৃতবান্ধৱ উপসংহাৰে' কালীপ্ৰসন্ন সিংহ এই প্ৰবাদটি উদ্ধৃত কৰেন—

আদি সভা বন বিৰাটৰ কত দূৰ । ইহা ৰচি কাশীদাস গেল স্বৰ্গপুৰ ।  
ডক্টৰ দীনেশচন্দ্ৰ সেন ও ডক্টৰ স্বকুমাৰ সেন তাঁহাদেৱ সাহিত্যেৰ ইতিহাসে ঐ প্ৰবাদ উদ্ধৃত কৰিয়া মোটামুটি এই মতেৰ সমৰ্থনই কৰিয়াছেন ।

সম্প্ৰতি কাশীৰাম দাসেৰ বনপৰ্বৰে কয়েকটি পুথি দেখিয়া উক্ত ধাৰণা পৰিবৰ্ত্তনেৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰিতেছি । মৎসংগৃহীত বনপৰ্বৰে একখানি পুথিৰ শেবাংশ হুবহু উদ্ধৃত কৰিয়া দিতেছি—

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ধনু ছিল কায়েস্ত কুলেতে কাশীদাস ।  | চাৰি পৰ্ব মহাভাৱত কৰিল প্ৰকাশ ॥                    |
| আন্ত সভা বিৰাটৰ ৰচিলা পাচালি ।     | তাহা শুনি সৰ্ব লোক ধনু ২ বলি ॥                     |
| পূৰ্বে তিহো আৱস্ত কৰিলা এই পুথি ।  | কালবশে মৃত্যু তাৰ হইল দৈবগতি ॥                     |
| আগন্ত উপাৰ্জন কৰি হইল কালপ্ৰাপ্ত । | বনেৰ বিচিত্ৰ কথা নহিল সমাপ্ত ॥ [১৬৫খ]              |
| আৱস্ত অবধি পড়ি ছুখ লাগে মনে ।     | চিৱদিন চিন্তা ছিল তাহাৰ কাৰণে ॥                    |
| তে কাৰণে প্ৰসঙ্গ বনেৰ জত শেষ ।     | পাচালি প্ৰবন্ধে কৈল মনেৰ আবেশ ॥                    |
| লোকপ্ৰষ্ট কাশীদাস ছিল পুণ্যবান ।   | সৰ্বগুণে শূন্য আমি বিশেষে অজ্ঞান ॥                 |
| কাশীদাস বিচাৰ কৰিয়াছিল পোতা ।     | আমি মাত্ৰ লোকমুখে শুনি সেই কথা ॥                   |
| অজ্ঞান সময় সেই বহুদিন হৈল ।       | মন্দ মতিমান মনে কিছু না আছিল ॥                     |
| পাচালি ৰচিছ আমি সেই অমুসাৰে ।      | দোষগুণ সমৰ্পণ কৰিয়া দৈবৰে ॥                       |
| মোৰ কিছু ভালমন্দ নাই লাগে দায় ।   | সমৰ্পণ কৰিয়াছি দৈবৰেৰ পায় ॥                      |
| আৰ এক কথা মোৰ কৰ অবধান ।           | নানা মতে সূধাপান আশ্বাদ সমান ॥                     |
| সমুদ্ৰ না ছাড়ে জেন ধুৱ নদিৰ জল ।  | সেই মত শুন ইহা পণ্ডিত সকল ॥                        |
| পঞ্চপুণ্ড বস শৰি পৰিমাণ শক ।       | পাচালি প্ৰবন্ধেতে শেষ অৱশ্যক ॥ ১৬০৫ ॥ <sup>১</sup> |
| অমুক্ষণ কৃষ্ণপদে মজাইয়া চিত ।     | বিৱচিল তনয়শিখৰ স্তত জিত ॥                         |
| ভাৱত পঞ্চজ পৰ্ব প্ৰষ্ট অৱশ্যক ।    | আদি সভা বিৰাট বন কৰিল লিখক ॥                       |
| এই চাৰি পৰ্ব পুস্তক কাশীদাসি ।     | উদজোগ আদি ছয় পৰ্ব শিবৰাম ঘোষি ॥ <sup>২</sup>      |
| ঐবীক আদি আট পৰ্ব চাহিয়া বেড়াই ।  | তাৰাৰ নিমিস্তে সদা দৈবৰ ধোয়াই ॥ ৫৮                |

বনপৰ্ব সমাপ্ত

১. লিপিকৰ কি কৰিয়া 'পুণ্ড'কে (০) শূন্য বলিয়া ধৰিলেন জ্ঞানি না ।

২. শিবৰাম ঘোষেৰ ছয় পৰ্ব মহাভাৱতৰ কোন হৃদিশ নাই । শ্ৰীনিৱৰ্দ্ধন চক্ৰবৰ্ত্তী মহাশয়েৰ নিকট শিবৰামেৰ মহাভাৱত পুথিৰ কয়েকটি পত্ৰ আছে শুনিয়াছি ।

আক্ষরমিদং শ্রীমহাদেব নম্ভব সাকিম পাইকপাড়া। পুস্তকমিদং শ্রীযুত জগতরাম হালদার  
সাকিম সচিনন্দনপুর। [ ১৬৬ ]

অপ্রত্যাশিত ভাবে অল্পরূপ উক্তি পাইয়াছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি  
আশ্চর্য পর্বের পুথিতে ( সংখ্যা ২৭২৪ )—

কায়স্থ কুলেতে ধন্ত ছিল কাশীদাস। চারি পর্ব ভারতের করিল প্রকাশ ॥  
আদি সভা বিরাটাদি সজ্জিত পাচালি। ইহা শুনি সর্বলোক ধন্ত ধন্ত বলি ॥  
পূর্বে বনপর্ব আরম্ভিঞাছিল পুথি (১)। [২৪ক] কালবশে মৃত্যু তার হৈল উপনীতি ॥  
অগস্তি আশ্রয় করি হৈল কৃষ্ণপ্রাপ্তি। বনের বিচিত্র কথা মহিল সমাপ্তি ॥...[২৪খ]

মৎসংগৃহীত আর-একখানি বনপর্বের পুথিতে আরও নির্দিষ্টভাবে কাশীরামের রচনার  
পরিমাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। অগস্ত্য উপাখ্যানে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পর  
লোমশ মুনি কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে ভৃগুরামের পরাজয়কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাতে বলা  
হইয়াছে—

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| তবে বহুবিধি স্তুতি করি ভৃগুরাম। | হতবীৰ্য বনে গেল বন্দিয়া শ্রীরাম ॥      |
| মুনি বলে কহিলাও অগস্ত্য আশ্রয়। | শুনি জুধিষ্ঠির রাজা হরষ বিধান ॥         |
| কাশীদাস কহে এই অমৃত সমান।       | কর্ণপথে সাধু নর সদা কর পান ॥            |
| এতবধি বনপর্ব কাশীদাস কৈল।       | অবধান করি সন্তে একান্তে শুনিল ॥         |
| না হইতে বনপর্ব কথা সমাধান।      | কাশীদাস করিলেন স্বর্গের পয়ান ॥         |
| সেধরতনয় জিত বিচারিয়া মনে।     | বনপর্ব অবশেষ করিল রচনে ॥                |
| শুন শুন সাধুলোক হৈয়া সাবধান।   | শুনিলে পরম সুখ জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥ [৪৬ক] |

পুথিখানি খণ্ডিত, ১ হইতে ১১৩খ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আছে। ১১১ক পৃষ্ঠায় সন ১২১২ সাল  
লিখিত আছে। ইহাকে লিপিকাল ধরিলে সম্ভবতঃ অস্থায় হইবে না। এই পুথিতে অগস্ত্য  
উপাখ্যানের পর আর কোথাও কাশীরামের ভণিতা চোখে পড়িল না।

কোন কোন বনপর্ব পুথির শেষে কাশীরামের তিন পর্ব রচনারও উল্লেখ দেখিতে  
পাওয়া যায়। যথা—

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ধন্ত ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।        | তিন পর্ব ভারত তিহো করিলা প্রকাশ ॥ |
| আদি সভা বন রচিল পাচালি।                 | তাহা শুনি সর্বলোক ধন্ত ধন্ত বলি ॥ |
| পূর্বে তিহো আরম্ভ করিলা এই পুথি।        | কালবশে তাঁহাকে লইতে আইল রথি ॥     |
| পরম বৈষ্ণব তিহো গেলা স্বর্গবাসে।        | পাঁচালি প্রবন্ধে রচিল তার দাসে ॥  |
| —সাহিত্য-পরিষৎ-পুথিসংখ্যা ৭৩৯, পৃ. ১১৩খ |                                   |
| ধন্ত ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।        | তিন পর্ব ভারতের করিল প্রকাশ ॥     |
| আদি সভা বনের যে রচিল পাচালি।            | যাহা শুনি সর্বলোক ধন্ত ২ বলি ॥    |
| পূর্বে তেহো আরম্ভিয়াছিল এই পুথি।       | পরম বৈষ্ণব তেহো হইলা স্বর্গগতি ॥  |

তাহার আলয় এই করিয়া রচন।

অতঃপর বনপর্ক হইলা সমাধান ॥

—সাহিত্য-পরিষৎ-পুঁথিসংখ্যা ২৭১৩, পৃ. ১৮২খ .

ধন্য ছিল কায়েস্থ কুলেতে কাশীদাস।

তিন পর্ক ভারতের করিল প্রকাশ ॥

আদি সভা বনের জেয় করিয়া পাঁচালি।

যাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ২ বলি ॥

পূর্বে তেহো আরস্তিয়াছিল এই পুঁথি।

তার পর তাহার হইল স্বর্গগতি ॥

তাহার আসন্ন এই করিয়া রচন।

অতঃপর বনপর্ক হইল সমাধান ॥

—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুঁথিসংখ্যা ১৮৩৪, পৃ. ১২৩ক

আমার সংগৃহীত একখানি খণ্ডিত বনপর্কের পুঁথিতে কাশীরামের তিন পর্ক রচনার কথা বলিয়াও তিনি আদি সভা বিরাট ও বনপর্কের কিয়দংশ রচনা করেন, এই কথা বলা হইয়াছে। ঐ বর্ণনা হইতে আরও জানা যায় যে, কাশীরাম ‘নিজ পুঁথকে’ তাঁহার আরও কাব্য সম্পন্ন করিতে নির্দেশ দেন।\*

ধন্য ছিল কায়েস্থ কুলেতে কাশীদাস।

তিন পর্ক ভারতের করিল প্রকাশ ॥

আদি সভা বিরাট রচিলা পাঁচালি।

তাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ২ বলি ॥

পূর্বে তিহো আরস্ত করিলা এই পুঁথি।

কালবশে তাঁহাকে লইতে আইল রথি ॥

পরম বৈষ্ণব তিনি গেলেন স্বর্গবাসে।

তাঁহার আজ্ঞায় বিরচিল তার দাসে ॥

আদি সভা বিরাট বনের কত দূর।

ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর ॥

জাতাকালে কহে নিজ পুঁথেরে ডাকিয়ে।

মোর সব শূন্যগ্রন্থ পূর্ণ কর গিয়ে ॥

তাঁহার আজ্ঞায় ত কাশীর নন্দন।

মহাশ্রম করিয়া করিল সমাপন ॥

সাধুজন চরণেতে করি নমস্কার।

শক্তিমত রচিলেক করিয়া পয়ার ॥

মহাভারতের কথা স্বধাসিদ্ধুবত।

কাশীর নন্দন কহে হইল সমাপ্ত ॥ [১৪১খ]

—লিপিকাল ১৭২১ শকাব্দ, পানিহাটি অঞ্চলের পুঁথি

উপরি উদ্ধৃত তথ্যাবলী বিচার করিয়া আমরা আপাততঃ বোধ হয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, কাশীরাম নিঃসংশয়িতভাবে আদি, সভা ও বনপর্কের কিয়দংশ রচনা করেন। তিনি আগে বিরাটপর্ক রচনা করিয়াও পরে বনপর্ক রচনা করিতে পারেন।

৩. কাশীরামের ‘ভ্রাতৃপুত্র’ নন্দরাম দাসও নিজপক্ষে অল্পরূপ উক্তি করিয়াছেন—

কাশীদাস মহাশয় তেহো জ্যেষ্ঠতাত।

মিত্রকালে আজ্ঞা কৈল শিরে দিয়া হাত ॥

আউ অবশেষ বাপু জাই পরলোকে।

রচিতে না পাইল আমি বড় বইল শোকে ॥

আশীর্বাদ করি আমি বলিএ তোমারে।

পাণ্ডবচরিত্র বাপু রচিবে সাদরে ॥

তার আজ্ঞা শিরে ধরি ভাবি রাখাশ্রাম।

দ্রোণপর্ক ভারত রচিলা নন্দরাম ॥

—সাহিত্য-পরিষৎ-পুঁথিসংখ্যা ৬৬৮, পৃ. ৩ ক-খ

ডক্টর জুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (১৩৫৫), ৪৫৯ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

(কবি অনিরুদ্ধ উজোগ পর্ক, ভীষ্মপর্ক রচনার পর বনপর্ক রচনা করেন।\*) সক্ষ্য করিবাব বিষয়, কাশীরামের নির্দিষ্ট রচনার যে কয়টি সাক্ষ্য এখানে উপস্থাপিত হইয়াছে বা আমার নিকট আছে, তাহার প্রায় সবগুলিতেই তাঁহার বিরটিপর্ক রচনার উল্লেখ দেখিতে পাই। অবশ্য ব্যাপকভাবে বিরটি পর্কের পুথিগুলি পরীক্ষা না করা পর্যন্ত জোর করিয়া কিছু বলা সমীচীন নয়।

কাশীদাসী বনপর্কের অগস্ত্য উপাখ্যানের পর মোটামুটি এই ভণিতাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়— শেখরতনয় জিত, জিত ঘটক,\* দ্বৈপায়ন দাস, কাশীর দাস বা কাশীর নন্দন। ‘তনয় শিখর শুভজিত’ পাঠে কিছু গোলমাল আছে বলিয়া মনে হয়। আমার নিকট একটি মুঘল পর্কের পুথিতে পুরোক্ত শক সহ (পঞ্চ পুষ্প রস শশি) ‘শিখরতনয় যুত জিত’ ভণিতা আছে। দ্বৈপায়ন দাস কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া মনে হয় না। অধিকাংশ স্থলেই ‘বিরচিল ভার দাস’ অর্থাৎ ব্যাসের দাস, কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন দাস। ভারত পাঁচালীর অপর কবির সহিতও এই নাম মিলিতে পারে। হরিনারায়ণ দেব যেমন ‘সঞ্জয়াভিমান’ মহাভারতের কবি বা গায়ন ছিলেন,\* সেইরূপ কাশীর নন্দনও দ্বৈপায়ন দাস নাম গ্রহণ করিতে পারেন। মৎসংগৃহীত একখানি দ্রোণপর্কের পুথিতে রামনারায়ণ সহ ‘ব্যাসদেব দাস’ ভণিতা দেখিয়াছি। কাশীর দাস কাশীর নন্দনের সহিত জিতের কোন সম্পর্ক আছে কি না অল্পসন্দানযোগ্য। একই রচনা, ভণিতা পৃথক এবং কোন ভণিতাই স্পষ্টচূর নয়। এই কবি বা কবিকুলের বিচ্ছিন্ন পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত কোন সার্থক আলোচনা করা যাইবে না।

কাশীদাসী বনপর্কের অগস্ত্য উপাখ্যানের পর মোটামুটি সমস্ত পুথিতেই একই কাহিনী ও একই ভাষা অল্পসরণ করা হইয়াছে। শেষ দিকে ধর্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা উক্ত কবি বা কবিকুলের রচনা নাও হইতে পারে। সব পুথিতে এই কাহিনী নাই, আবার ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। একটি কাহিনীতে ‘পক্ষ’রূপী ধর্মের যুধিষ্ঠিরকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আছে (সংস্কৃত শ্লোক সহ), আর একটি কাহিনীতে প্রশ্ন-চতুষ্টয় নাই, কিন্তু লাভগণের ও পত্নীর মৃত্যুতে যুধিষ্ঠিরের দীর্ঘ বিলাপ আছে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুথিসংখ্যা ১৭৪৬ ও ১৮৩৪ দ্রষ্টব্য)। আমার নিকট দুইখানি পুথিতে এই কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপও দেখিয়াছি।

৪. পূর্বত রচিলে পদ অতি অল্পপায় উজোগর আত্মকথা ভাগবত নাম।

ভীষ্মপর্ক নিবন্ধিলে ভীষ্মর নির্বাণ পাছে ঘোষষাড়া বনপর্ক যার নাম।

৫. ত্রিপকানন মণ্ডল মহাশয় এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, বনপর্কের অগস্ত্য উপাখ্যানের পর হইতেই জিত ঘটক ভণিতা আরম্ভ। পকাননবাবুর সংকলিত পুথিপরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৬৪), ২৮৭ পৃষ্ঠায় ঐ ভণিতা মিলিবে।

৬. বাহালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (১৩২১), মুনশী আবদুল করিম সংকলিত, পৃ. ১৭১-৭৩ দ্রষ্টব্য।

## শ্রীনিবাস-নরোত্তমের কালনির্ণয়

পূর্বানুভূতি

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

শ্রীনিবাস আচার্য্য তিন বার বৃন্দাবনে যান। প্রথম ও দ্বিতীয় বাব গমনের মধ্যে বেশ-কিছু সময়ের তফাত, আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার গমনের মধ্যেও বেশ ব্যবধান। পূর্বেই কর্ণপুর কবিরাজের বিবরণ হইতে দেখাইয়াছি যে, প্রথম বার বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর শ্রীনিবাস আচার্য্য বিবাহ করেন। বিবাহের পর রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অম্মরাগবল্লীও বলেন—

বিবাহ করিতে যত্ন অনেক প্রকার।

করিল প্রভৃতি আদি ঠাকুর সরকার ॥ (নরহরি সরকার)

সভাকার উপরোধে বিবাহ করিল।

ভক্তিগ্রন্থ অনেক জনেই পঢ়াইল ॥

সিদ্ধান্ত-সার রস-সার আচরণ করি।

রাগানুগা মার্গ জানাইল সর্বোপরি ॥

শ্রীগোসাঞি জিউর আশ্রয় পালন করিলা।

এই মত কথোক কাল সেখানে রহিলা ॥ (পৃ. ৩৮)

তার পর শ্রীনিবাসের মনে

বৃন্দাবনে যাইবারে উৎকণ্ঠা বাড়িলা।

পুনর্ব্বার সব ছাড়ি যাত্রা করিলা ॥ —ষষ্ঠ মঙ্গলী, পৃ. ৩৮

এইবার বৃন্দাবনে যাইলে গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাঁহাকে অবিবাহিত জানিয়া বা ভাবিয়া রাধারমণ বিগ্রহের সেবার ভার লইতে বলেন। শ্রীনিবাসও রাজি হইলেন। এ দিকে অনেক দিন চলিয়া গেল, অথচ তিনি ফিরিলেন না দেখিয়া তাঁহার পত্নী চিন্তিত হইলেন। তিনি রামচন্দ্র কবিরাজকে ডাকিয়া বলিলেন—

তুমি বৃন্দাবন গেলে এ সন্সার হয়।

একবার তাঁর তত্ত্ব করিতে যুয়ায় ॥

রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের খোঁজখবর লইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। বৃন্দাবন পৌছাইতেই তাঁহার সঙ্গে গোপাল ভট্টের দেখা হইল এবং তিনি তাঁহাকে বৃন্দাবনে আসিবার কারণ বলিলেন। তাহাতে গোপাল ভট্ট গোস্বামী বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীনিবাস বিবাহ করিয়াছেন। শ্রীনিবাসকে ডাকিয়া

গোসাঞি কহে এত মিথ্যা কহিলা আমারে।

কোন ধর্ম্ম বুঝিয়াছ বুঝিব বিচারে ॥

ঠাকুর কহয়ে তোমার চরণ বন্দন ।  
 গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ দরশন ॥  
 শ্রীজীব গোসাঞি সঙ্গ বৃন্দাবন বাস ।  
 সভার সহিত কৃষ্ণ-কথায় বিলাস ॥  
 এত লভ্য হয় এক অসত্য বচনে ।  
 এই লোভে কহিয়াছো সঙ্কোচিত মনে ॥  
 এত কহি ঠাকুর দণ্ড-প্রণাম করিল ।  
 হাসি হাসি ভট্ট গোসাঞি আলিঙ্গন কৈল ॥  
 মিথ্যা কহিয়াও তুমি জ্বিনলে আমারে ।  
 কিছু দোষ নাহি ইথি ক'হিল তোমারে ॥  
 কিন্তু শ্রীরাধারমণের অধিকারী ।  
 বৈরাগী নহিলে আমি করিতে না পার ॥

—অন্নবাগবলী, ষষ্ঠ মঞ্জরী, পৃ. ৩২-৪০

তৃতীয় বার যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে যান, তখন তাঁহার পুত্র বৃন্দাবনবল্লভ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন—

বড় পুত্র বৃন্দাবনবল্লভ ঠাকুর ।  
 সঙ্গে বড় কবিরাজ আনন্দ প্রচুর ॥

—অন্নবাগবলী, পৃ. ৪১

বড় কবিরাজ বলিতে গোবিন্দদাস কবিরাজের বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ ।  
 প্রাচীন গ্রন্থাদির এই সব বিবরণ হইতে শ্রীনিবাসের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাউক ।  
 শ্রীনিবাস যখন পুরীতে যাইতেছিলেন, তখন পথের মধ্যে তিনি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানবার্তা শুনিতে পান । স্মৃত্যং ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স অন্ততঃ ১৬।১৭ বৎসর হইয়াছিল । যখন রেলপথে যাইবার সুযোগ ছিল না, তখন ইহার চেয়ে অল্প বয়সে কেহ মাতা বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গ ছাড়া পুরীতে যাইতেন না । তাহা হইলে শ্রীনিবাসের জন্ম ১৫১৬।১৭ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে পারি । তার পর তিনি যখন প্রথম বার বৃন্দাবনে যাইতেছেন, তখন কর্ণপুরকবিরাজের মতে—শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর ৩ তাঁহার জ্যেষ্ঠ সনাতনের পাঁচপদ্যযুগল (মনে মনে) হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি আনন্দে সত্বর ব্রজে প্রবেশ করিলেন । মথুরানগরে তিনি শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের অপ্রকটবার্তা শুনিয়া মুচ্ছিত হইলেন (১২) । পরে 'হা রূপ কোথায় গেলে ? হা সনাতন কোথায় গেলে' ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন (২০) । 'সনাতন' গোস্বামী বৈষ্ণবতোষণী নামে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ১৪৭৬ শকাব্দে বা ১৫১৪-খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন । উহাতে ১০।১২।১৬ এবং ১০।৩২।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীকৃষ্ণের উজ্জলনীলমণির উল্লেখ আছে । স্মৃত্যং ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে উজ্জলনীলমণি রচিত হয় । শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি

১৪৬৩ শকাব্দে বা ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়; এই গ্রন্থের (বহুবমপুর সংস্করণ) ১২০ পৃষ্ঠায় হরিভক্তিবিলাসের ও ২১২ পৃষ্ঠায় বৃহত্তাগবতামৃতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। স্মরণ্য ঐ দুইখানি গ্রন্থ ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের রচনা। যাহা হউক, ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সনাতন গোস্থামী জীবিত ছিলেন। কর্ণপুর কবিরাজের বিবরণে দেখা যাইতেছে যে, রূপ ও সনাতন প্রায় একই সময়ে অগ্রকট হন। ব্রহ্মমণ্ডলে অতাপি আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা গুরুপূর্ণিমা তিথিতে সনাতন গোস্থামীর ও উহার ২৭ দিন পরে শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীকৃষ্ণ গোস্থামীর তিরোভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। তাঁহার দুই ভাই খুসন্তব ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন। কারণ, শ্রীজীব তাঁহার মাধবমহোৎসব কাব্য ঐ সালে রচনা করেন এবং উহাতে সনাতন গোস্থামীর কথা এমন ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয়, সনাতনের শ্রীবন্দাবনপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। যথা—

অজিযুগ্মমিহ সার-সারস-

স্পর্ধি মূর্ধনি দধাতু মামকে।

যঃ সনাতনভয়া অ বিদ্যতে

বৃন্দাবনমমন্দ-মন্দিরম্ ॥ (তৃতীয় শ্লোক)

এই শ্লোকে এক অর্থে কৃষ্ণের কথা, অত্র অর্থে সনাতন গোস্থামীর কথা বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ পক্ষ অর্ধ যিনি সনাতনভয়া অর্থাৎ স্থানিচলরূপে বৃন্দাবনে বাস করেন— যিনি বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি। আর শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই সনাতন সঙ্ক্ষে অর্ধ— যিনি চিরকালের জন্য বৃন্দাবন লাভ করিয়াছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (বাঙ্গলার ইতিহাস, পৃ. ৩১০) কোন প্রমাণ না দেখাইয়া লিখিয়াছেন যে, সনাতন ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং রূপ ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রকট হন। সমসাময়িক লেখকের উক্তি ইহার বিরুদ্ধে যায়।

কর্ণপুর কবিরাজ বলেন যে, শ্রীনিবাস বৈশাখ মাসে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনের কিছুকাল পূর্বে—শ্রীজীব বৃন্দাবনে আসেন।

সনাতন প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভু সত্বর স্তুতি শিশু শ্রীজীব গোস্থামীকে বৃন্দাবনে আকর্ষণ করিয়া আনাইয়া যমুনাজলে স্নান করাইলেন ও রূপাপরবশ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া বলিলেন (২২),—‘বৎস! আমার কথা শুন। ব্রজে তোমাকে এই জন্ম স্থাপিত করা হইল যে, তুমি মদীয় গ্রন্থাদির বালবোধিনী সরলা টাকা প্রণয়ন করিয়া শ্রীহরিতে বিশুদ্ধা ভক্তির স্থাপন কর; গোবিন্দের সেবা কর ও পাষণ্ডের নিবারণ কর (২৩)।’ এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদযুগলে শ্রীজীব বলিলেন—‘হে নাথ! আমি যে শিশু, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব, এত বড় কাজ কবিবার আমার শক্তি কোথায়? সঙ্গীই বা কোথায়? আজ্ঞা যদি পালনই করিতে হয়, তবে শুদ্ধমতি সঙ্গী আপনি দিন (২৪)। শ্রীজীবের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে একটু চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—‘শোন, আমি তোমাকে সঙ্গী দিতেছি। আগামী বৈশাখ মাসে কৃষ্ণভট্ট এক ব্রাহ্মণকুমার ব্রজে আসিয়া তোমার সঙ্গী হইবে’ (২৫)।

শ্রীনিবাস তাহা হইলে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীবৃন্দাবনে পৌছিয়াছিলেন।  
•তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর। তিনি দেখিতে রোগা পাংলা— ক্লান্ত হইয়াছিলেন।  
তাঁহার তৎকালীন চেহারার একটি ছবি কর্ণপুর কবিরাজ আঁকিয়াছেন—

“ইনি তখন কোপীন, বহির্বাস ও তুলসীমালা ধারণ করিতেন, রাধাকৃষ্ণের রঞ্জে তিলক  
এবং গায়ে নামাক্ষর (কৃষ্ণনাম) লিখিতেন, নেত্রদ্বয় ও মন গ্রন্থে নিবিষ্ট রাখিতেন এবং  
হস্তদ্বয়ে লেখনী ও পত্র (তালপত্র) রাখিয়া বৈষ্ণবগণের সঙ্গে লোমের আসনে বসিয়া  
কাল কাটাইতেন (৩২)।” এই বর্ণনা হইতে পাওয়া যায় যে, শ্রীনিবাস বিবাহের পূর্বে  
রীতিমত বৈরাগীর বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস প্রথম বার বৃন্দাবনে যাইয়া কত দিন  
ছিলেন জানা যায় না। কর্ণপুর কবিরাজ বলেন—

এবং যো বহুকালমাত্রমনয়ং কুর্বন্ ব্রজে প্রত্যহং (৪২)

এইরূপে প্রত্যহ সেবা ও ‘গ্রন্থস্তান্ধ্যাসনং’ (৪৮) করিতে করিতে ব্রজে বহুদিন  
অতিবাহিত করিলেন। যদি শ্রীনিবাস চারি-পাঁচ বৎসর বৃন্দাবনে ছিলেন অনুমান করা যায়,  
তাহা হইলে ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স যখন আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর, তখন পৌড়ে  
প্রত্যাবর্তন করেন ও বিবাহ করেন। চারি-পাঁচ বৎসরের বেশী তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন অনুমান  
করিলে এক দিকে তাঁহার বিবাহের বয়স যেমন পার হইয়া যায়, তেমনি আবার নরহরি  
সরকার ঠাকুরের প্রকট থাকা ও শ্রীনিবাসকে বিবাহ করিতে আদেশ দেওয়াও কঠিন হয়।  
প্রবাদ, নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র  
রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখরের নিম্নলিখিত পদটি অকৃত্রিম কি না বলা যায় না—

গৌরাক্ষ জন্মের আগে                      বিবিধ রাগিণী রাগে  
ব্রজবস করিলেন গান।  
হেন নরহরি সঙ্গ                      পাঞ পদ শ্রীগৌরাক্ষ  
বড় স্থখে জুড়াইলা প্রাণ।

—গৌরপদতরঙ্গিনী, ২য় সং, পৃ. ৩০২

অধ্যাপক ষষ্ঠীজমোহন ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম রায়শেখরের পদবেলী  
সম্পাদনা করিবার সময় কোন পুথিতে এই পদটি পান নাই বলিয়া তাঁহার সঙ্কলনে ইহাকে  
স্থান দেন নাই। যদি নরহরি সরকারকে শ্রীচৈতন্যের সমানবয়সী বলিয়াও ধরা যায়, তাহা  
হইলে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স চুয়াত্তর-পঁচাত্তর হয়।

গোপাল ভট্টের জীবনকাল বিচার করিয়াও শ্রীনিবাসের প্রথম বারে বৃন্দাবন হইতে  
প্রত্যাগমন ও দ্বিতীয় বারে বৃন্দাবন গমনের সময় নির্ণয় করা প্রয়োজন। মুরারি গুপ্তের  
কড়চা (৩।১৫।১৪-১৬, যে অধ্যায় পরমানন্দ সেন কবি কর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে  
অনুসরণ করেন নাই) অনুসারে ১৪৩২-৩৩ শকে অর্থাৎ ১৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল ভট্ট  
শিশু অবস্থায় শ্রীচৈতন্যের রূপা পাইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে  
তাঁহার জন্ম ১৫০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে হওয়া সম্ভব। ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস পৌড়ে প্রত্যাবর্তন

করিবার পর যদি বিবাহ করেন ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিয়া ১২।১৩ বৎসর কাটান এবং তার পর বৃন্দাবনে যাইয়া বছর দুই বাস করেন, তাহা হইলে তিনি ষখন দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন হইতে শ্রামানন্দের সঙ্গে গোঁড়ে ফেরেন, সে সময়ে অর্থাৎ ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল ভট্টের বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হয়। এই বয়সে তাঁহার পক্ষে রাধারমণের সেবার তার দিব্য উপযুক্ত লোক খোঁজা স্বাভাবিক।

ঐনিবাস দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর বীর হাঙ্গীরকে শিষ্ট করেন, তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। সম্ভবতঃ গোড়দেশে দুই-চার মাস বাস করিয়া তিনি উৎকলে গোস্বামীদের গ্রন্থ প্রচার করিতে যাইতেছিলেন। -পথে ঐ গ্রন্থ চুরি যায় এবং সেই সূত্রে বীর হাঙ্গীরের বাজসভায় তিনি উপস্থিত হন। এইবার দেখা যাক, ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাঙ্গীর রাজ্য হইয়াছিলেন কি না।

বীর হাঙ্গীর আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালের একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ একটি অঙ্গ প্রচলন করেন, তাহার নাম মল্লাঙ্গ। বিষ্ণুপুরের রাজবংশের শুধু নহে, ঐ অঞ্চলের লোকেরাও মল্লাঙ্গে কালনির্দেশ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ডাঃ ব্লক বিষ্ণুপুরের একটি মন্দিরে ১০৬৪ মল্লাঙ্গ ও ১৬৮০ শক পাইয়া স্থির করেন যে, ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মল্লাঙ্গ শুরু হয়। অভয়পদ মল্লিক মহাশয় বলেন (*History of Vishnupur Raj*, পৃ. ৮২) যে, ভাস্কর মাসের ইন্দ্রবাদনী তিথিতে মল্লাঙ্গের প্রবর্তন হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় ব্লকেব মত মানিয়া লইয়া ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মল্লাঙ্গের আরম্ভ হওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছেন (*Indian Historical Quarterly*, ১৯২৭, পৃ. ১৮০-৮১)। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণা প্রকাশিত হইবার পূর্বে প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশ্বকোষে “বিষ্ণুপুর” শব্দ লিখিবার সময় ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে মল্লাঙ্গের আরম্ভ করেন এবং সেই গণনা অনুসারে লেখেন যে, বীর হাঙ্গীরের রাজ্যকাল আরম্ভ হয় ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। ৭১৫ ও ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পার্থক্য ২১ বছরের। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ২১ বৎসর বাদ দিলে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। নগেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হান্টার সাহেবের *Statistical Accounts of Bengal* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (পৃ. ২৩৫) বীর হাঙ্গীরের সিংহাসনাধিরোহণ ৮৮১ মল্লাঙ্গে লিখিত আছে দেখিয়া ৮৮১-র সহিত তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা অনুসারে মল্লাঙ্গের প্রারম্ভকাল ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ যোগ করিয়া ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছিলেন। ঐ ভুল সহ হান্টার সাহেবের মত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার *Vaishnava Literature* গ্রন্থে (পৃ. ১০৯) পুনরাবৃত্তি করেন। ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হান্টার সাহেবের পক্ষে বিষ্ণুপুরের প্রাচীন কাগজপত্র পাওয়ার যতটা সুবিধা ছিল, তাহার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অভয়পদ মল্লিক মহাশয়ের পক্ষে ততটা ছিল না। সেই জন্য আমরা হান্টার সাহেবের মত মানিয়া লইয়া বীর হাঙ্গীরের রাজ্যকালের আরম্ভ ৮৮১ মল্লাঙ্গ বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নিরূপণ করিতেছি।

ড. রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় কোন প্রকার যুক্তি না দেখাইয়া হান্টার সাহেবের মত

অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে L. S. S. O'Malley কর্তৃক সম্পাদিত বাঁকুড়া গেজেটিয়ারের মত মানিয়া লইয়াছেন। ঐ গ্রন্থে পরস্পর-বিরোধী উক্তি আছে। উহার ২৬ পৃষ্ঠায় আছে—“The reign of Bir Hambir fell between 1591 and 1616” ; কিন্তু ১৫৮ পৃষ্ঠায় আছে যে, মল্লেশ্বর-মন্দিরের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাম্বীর ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যে রাজার ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যাবসান হয়, তিনি ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে কি করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন ? বস্তুতঃ বীর হাম্বীর ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নাই— বীরসিংহ করিয়াছেন। ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের Archaeological Survey of India'র রিপোর্টের অষ্টম খণ্ডে (পৃ. ২০৩) আছে—“The oldest dated temple in Bishnupur is known as the Mallesvara temple, which has long been regarded as the oldest in Bishnupur, and as dating back to near the beginning of the Malla era, chiefly on the strength of the inscription of which Bishnupur enjoys its fame as a very ancient city, the inscription is dated clearly in saka 928, but this is a mistake, the word saka having through some oversight been put instead of Mallabda, and the proof of it is to be seen in the next few lines, where the Temple is stated to have been built by Vira Sinha in the year 'Vasu Kara Hara Malla Saka' i.e. 928 on the Malla era.”

মল্লেশ্বরমন্দিরে উৎকীর্ণ শ্লোকটির যে পাঠ অভয়পদ মল্লিক মহাশয় (পৃ. ৪১) ধরিয়াছেন, তাহাতে উপরে লিখিত রোমান লিপিতে প্রদত্ত অঙ্কবাচক শব্দগুলির মধ্যে একটি অন্তরূপে পাওয়া যাইতেছে। যথা—

বসুকরনবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন

অভিললিতং দেবকুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মে ॥

হর শব্দের পরিবর্তে এখানে নব শব্দ আছে। মল্লিক মহাশয় বলেন যে, মল্লেশ্বরমন্দির সম্ভবতঃ বীর হাম্বীর আরম্ভ করেন ; কিন্তু সহসা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তিনি উহার নির্মাণ শেষ করেন নাই, তাহার পুত্র রঘুনাথ উহা সমাপ্ত করেন এবং মন্দিরলিপিতে নিজের নাম উৎকীর্ণ না করিয়া পিতা বীরসিংহের নাম লেখেন। রঘুনাথের পিতা কিন্তু বীরসিংহ নহেন— বীর হাম্বীর। এই জ্ঞান মল্লিক মহাশয়কে বলিতে হইয়াছে—“In the inscription he named his father Beira Singha, through the title of 'Singha' was first gained by himself. It seems probable that out of respect for his father, he did not think it proper to name him as Hambeera, he himself being a Singh”। এই মত যুক্তিযুক্ত নহে। মল্লিক মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরে সে সময়ে বীতি ছিল যে, মন্দির তৈয়ারী করিয়া উহা নির্মাণকারীর পিতৃনামে আয়োপ করা। এ কথা যদি সত্য বলিয়া মানিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও রঘুনাথ তাহার পিতার নাম

বীর হাঙ্গীর না লিখিয়া বীরসিংহ লিখিবেন কেন? বীরসিংহ তো রঘুনাথের পুত্রের নাম। রঘুনাথ সিংহ ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রামরায়ের, ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জোড়বাংলার ও ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কালাচাঁদের মন্দির স্থাপন করেন এবং প্রত্যেকটিতে লেখেন—“শ্রীবীরহাঙ্গীরনরেশসুহৃদদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ।” ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মল্লিক মহাশয় যে মন্দির তৈয়ারী করিয়া পিতৃনামে উহা আরোপ করিবার কথা লিখিয়াছেন, তাহা অমূলক।

বাকুড়া গেজেটিয়ারে বীর হাঙ্গীরের রাজ্যকালের আরম্ভ ১৫৯১-খ্রীষ্টাব্দ বলিবার কারণ বোধ হয় এই যে, Elliot ও Dowson তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে (ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৬) লিখিয়াছেন যে, বীর হাঙ্গীর ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে বিষ্ণুপুর দুর্গে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার রাজ্যারম্ভ ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দের পরে হইতেই পারে না। কিন্তু আচার্য্য যদুনাথ সরকার *History of Bengal* (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০৮) গ্রন্থে স্মৃতির হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাঙ্গীর জগৎসিংহকে আশ্রয় দেন এবং তাহার জন্ত পাঠানো তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। “In 1590 Jagat Singh was saved from capture by the loyal Raja Vir Hambir taking him to his port of Bishnupur....After August 1590 the Afghans attacked Bir Hambir for his loyalty to the Delhie throne.” বাকুড়া গেজেটিয়ারে পরম্পরবিরোধী উক্তি থাকায় এবং আধুনিক গবেষণার বিরুদ্ধে কথা থাকায় বীর হাঙ্গীর সম্বন্ধীয় তারিখ গ্রহণ করা যায় না।

বীর হাঙ্গীরের কথা শেষ করিবার পূর্বে তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় দুই-একটি কথা বলিয়া লই। বীর হাঙ্গীর ভগিতায় দুইটি অতি স্বন্দর পদ ভক্তিরত্নাকরে (পৃ. ৫৮১-৮২) উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে “শুন গো মরম সখি, কালিয়া কমল আখি” ইত্যাদি পদটির ভগিতায় আছে—

এ বীর হাঙ্গীর চিত্র                      শ্রীনিবাস অল্পগত

মল্লি গেলা কালাচাঁদের পায় ॥

কালাচাঁদের প্রস্তরমন্দির তাঁহার পুত্র ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করিলেও, ঐ বিগ্রহ ঐ তারিখের পূর্বে ছিল জানা যাইতেছে। ভক্তিরত্নাকরপ্রথম পদটিতে আছে—

প্রভু মোর শ্রীনিবাস                      পুরাইলে মনের আশ

তুয়া বিহ্ন গতি নাহি আর।

আছিহ্ন বিষয় কীট                      বড়ই লাগিত মিট

ঘুচাইলা রাজ অহংকার ॥

করিহ্ন গরল পান                      সে ভেল ডাহিন বাম

দেখাইলা অমিয়ার ধার।

পিব পিব করে মন                      সব ভেল উচাটন

এ সব তোমার ব্যবহার ॥

ইহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, বীর হাধীর বৃষ্টি যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়িয়া দিয়া—এমন-কি, রাজ-কর্মও পরিত্যাগ করিয়া নিরস্তর ভজন সাধন করিতেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্তরূপ। বাহারিস্তানের প্রমাণবলে *History of Bengal* ( দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩৬, ২৪৯, ২৯২ ) গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন জাহাঙ্গীরের রাজ্যারম্ভ হয়, তখন বীরভূম ও বাকুড়ায় বীর হাধীর প্রায় স্বাধীন নৃপতি। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইসলাম ধানের নিকট বশতা স্বীকার করিলেও, পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজ্য চালনা করেন এবং ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনতা বজায় রাখেন। কাশিম খাঁ শেখ কমিলকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াও তাঁহাকে দমন করিতে পারেন নাই। বীর হাধীরের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় উড়িষ্যার গঙ্গপতি নৃপতি প্রতাপরুদ্রের আচরণ। চরিতামৃত পাঠ করিয়া মনে হয় যে, ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়া পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপ-রুদ্রকে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায়ের প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইয়াছিল। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। Naniz লিখিয়াছেন—“The king of Oriya came against him to defend his territories” ১৫১৫ হইতে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অনবরত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

বীর হাধীর যে ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই শ্রীনিবাস আচার্যের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র হইতে। শ্রীজীবের চারিখানি অত্যন্ত মূল্যবান পত্র কর্ণামনে ও ভক্তিরসিকবের শেষে মুদ্রিত আছে। পত্রগুলি সংস্কৃতে লেখা। দুইখানি পত্রের অম্বুবাদ নীচে দিতেছি এবং সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা যোগ করিতেছি।

#### প্রথম পত্র

স্বস্তি আমার সকল হৃদয়প্রদানকারী চরণযুগলযুক্ত শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যচরণে— এই আমি জীবনামধারী ( ব্যক্তি ) নমস্কার করিয়া জ্ঞাপন করিতেছি—

আপনাদের কুশল সর্বদা প্রার্থনা কবি, কিন্তু তাহা বহুদিন যাবৎ পাই নাই। এই স্তম্ভ আমার মন ভাগ্য। আমি সম্প্রতি দৈহিক নীরোগ আছি; অপর অস্ত্রোপাও সেইরূপ আছেন; কিন্তু শ্রীভূগর্ত গোস্বামী মহাশয় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন; তবে আত্মাকে শ্রীবন্দাবন-নাথের নিকট জ্ঞানপূর্বক অর্পণ করিয়াছেন, ইহাই বিশেষ। স্বজনগণের বিশেষতঃ শ্রীবন্দাবনবাসের কুশল লিখিবেন। আর সে কিছু পড়াশুনা করিতেছে কি না ( তাহাও লিখিবেন )। পরঞ্চ শ্রীব্যাসশর্ম্মার কাছে খবর লইয়া জানাইবেন যে, শ্রীবাসুদেব কবিরাজ কোথায় কেমন আছেন।

অপর, শ্রীসাম্যতসিদ্ধ, শ্রীমাধবমহোৎসব, উত্তরচম্পু, হরিনামামৃত, ইহাদের সংশোধন কিছু

বাকী আছে ; এবং বর্ষাকালও আসিয়া গিয়াছে । অতএব এখন পাঠান হইল না । পরে দৈবায়ু-  
গ্রহে পাঠানো যাইবে । আর এখানকার সকলের যথাযোগ্য নমস্কারাদি জানিবেন । এখানকার  
সকলকে আমার নমস্কারাদি জানাইবেন ইতি ভাদ্র সুদি । শ্রীরাজা মহাশয়কে শুভাশীষ ।

টীকা ।— এই পত্রখানি যখন লিখিত হয়, তখন শ্রীগোপালচম্পূর পূর্বচম্পু লেখা শেষ  
হইয়াছে ; কেননা, এখানে শুধু উত্তরচম্পু সংশোধন বাকী আছে লিখিত হইয়াছে, পূর্বচম্পু  
সম্বন্ধে কোন কথা নাই । পরের পত্রে দেখা যাইবে যে, পূর্বচম্পু পাঠান হইতেছে ।  
পূর্বচম্পু ১৬৪৫ সম্বৎ বা ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে এবং উত্তরচম্পু ১৫১৪ শকাব্দ বা ১৫২২  
খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় । সুতরাং এই পত্র ১৫৮২-র পরে এবং ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত  
হইয়াছিল । ইহাতে যে কয়টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সবই শ্রীজীবের  
রচনা । রসামৃতসিন্ধু বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বুঝাইতে পারে, উহা ১৫৪১  
খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় । কিন্তু শ্রীজীব নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী  
হইবেন না । সুতরাং শ্রীরসামৃতসিন্ধু বলিতে শ্রীজীবকৃত ‘শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ’ শীর্ষক  
গ্রন্থ বুঝাইতেছে । ঐ গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় ( হরিদাস দাস সংস্করণ ) গোপালচম্পু হইতে  
‘বনরুচিরচরিতঃ’ ইত্যাদি যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা আমি পূর্বচম্পুর ২২ চম্পুতে  
( পৃ. ২৭৩, পুরীদাসজীর সংস্করণ ) পাইয়াছি । সুতরাং ঐ গ্রন্থখানি শ্রীজীব পূর্বচম্পু রচনার  
পর লেখেন । মাধবমহোৎসব ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইলেও শ্রীজীব পুনরায় উহা সংশোধন  
করিবার প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন ।

রাজা মহাশয় বলিতে বীর হাঙ্গীর ছাড়া আর কাহাকেও বুঝাইতেছে না । ১৫২২  
খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বীর হাঙ্গীর যে শ্রীনিবাসের রূপা পাইয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ এই  
পত্রে পাওয়া যায় ।

বন্দাবনদাস বলিতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বুঝায় । শ্রীনিবাসের তিনটি পুত্র,  
চারিটি কন্যা হইয়াছিল—

বন্দাবনবল্লভ ঠাকুর বড় পুত্র ।

তার ছোট শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠাকুর পুত্র ॥

শ্রীহেমলতা ঠাকুরঝি ভগিনী তাহার ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরঝি ভগিনী তাহার ॥

শ্রীকানন ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি যমুনা অভিধান ।

সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি নাম ।

—অম্বরীগবলী, ৭ম মঞ্জরী, পৃ. ৪৪

হরিদাস দাস মহাশয় গোড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে ( পৃ. ১৩২২ ) ভ্রমক্রমে যমুনার নামটি  
ছাড়িয়া দিয়াছেন ।

ভৃগুর্ভ গোস্থামীর তিরোস্তাবের কথা সম্বন্ধে ডাঃ নাথ বলেন যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত  
যখন ভৃগুর্ভের আদেশ লইয়া লেখা হইয়াছিল, তখন এই পত্র চরিতামৃতরচনার আরম্ভের

২।১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬০৮-১২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু চরিতামৃত আরম্ভের সময়ে যে ভূগর্ভ জীবিত ছিলেন, সে কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন নাই। তিনি বাহাদুর আফগান পাইয়া গ্রন্থ আরম্ভ করেন, প্রথমে তাঁহাদের গুরুদের নাম লিখিয়াছেন। যেমন হরিদাস পণ্ডিতের গুরুর নাম দিয়া ১।৮-এর এই প্রকরণ আরম্ভ—

পণ্ডিত গোসাঁঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।

কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার মহা আর্ঘ্য।

তাঁহার অনন্ত গুণ কে কহ প্রকাশ।

তাঁর প্রিয়শিষ্য ঐহো পণ্ডিত হরিদাস।

তার পর—

কাশীপুর গোসাঁঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঁঞি।

সেইরূপ ভূগর্ভ গোসাঁঞির তিন জন শিষ্যের কথা বলিবার পূর্বে ভূগর্ভের নাম লওয়া হইয়াছে। যথা—

পণ্ডিত গোসাঁঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঁঞি।

চৈতন্যকথা বিনা মুখে আর কথা নাই।

তাঁর শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।

মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী প্রেমিক কৃষ্ণদাস।

লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, হরিদাস পণ্ডিতের গুরুর বৈরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, ঠিক সেই ভাষাতেই চৈতন্যদাস প্রভৃতির গুরুর কথাও বলা হইয়াছে।

#### দ্বিতীয় পত্র

অস্তি সমস্ত গুণের দ্বারা প্রশংসনীয় যে বন্ধুবর মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্য সমীপে— এই বৃন্দাবন হইতে জীব নামক ব্যক্তির সপ্রেম আলিঙ্গন ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপক এই প্রারম্ভ— শ্রীবৃন্দাবন বাসরূপ অভীষ্ট কল্যাণ এখানে অবশ্যই রহিয়াছে। আপনার কল্যাণ (সংবাদ) জানিতে সমুৎসুক থাকিলেও, মধ্যে মধ্যে তাহা শুনিতে না পাইয়া, বরং তাহার বিরুদ্ধ কথাও শুনিতে পাইয়া আমার চিত্ত পীড়িত আছে। অতএব যথাযোগ্য আপনার বর্তমান অবস্থা শুনাইয়া আমাকে সান্ত্বনা দিবেন।

অপর পূর্ব্বেকার পত্রের উত্তর আগেই দিয়াছি। এখন নিবেদন করিতেছি— বিরুদ্ধ ভগবৎভক্তের দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং দেহ বিদগ্ধ হওয়ায় শোক হইতেছে। তথাপি কর্তব্য করিতেছি, যদি ইহাতে শোক নিবৃত্ত হয়।

আরও পারমার্থিক শ্রামদাস আচার্য্য আপনার নকলাভে ইচ্ছুক এবং ব্যুৎপন্ন। অতএব ইহার সহিত প্রেমপূর্ব্বক শ্রীভগবদ্ভক্তি-বিচারাদিক্য করা উচিত। ঈদৃশ সহায় হইলে পাশ্চাত্যীও শান্ত হইবে। সম্প্রতি বৈষ্ণবতোষলী, দুর্গমসদমনী ও শ্রীগোপালচন্দ্র পুস্তক কয়খানি শোধন করিয়া বিচার করিয়া ইহার মারফৎ পাঠান হইতেছে। অতএব পুস্তকের

এবং বিচারের সংশোধনের জন্ত ইহার সহিত মিলিত হওয়া কর্তব্য। ইহাকে আত্মীয়বৎ পালন করিবেন।

অপর পূর্বে যে হরিনামায়ত ব্যাকরণ আপনার সঙ্গে পাঠান হইয়াছে, তাহা যদি পড়ানো হয়, তবে সে বিষয়ে ভাষাদি বৃত্তি প্রভৃতি দেখিয়া ভ্রমাদি শোধনের জন্ত অপর একখানি পরিশিষ্ট পুস্তকও এখানে আছে; যদি সেটি আপনি চাহেন তো জানাইবেন। সম্প্রতি শ্রীমৎ উত্তর গোপালচন্দ্র লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিচার প্রয়োজন। নিবেদন ইতি।

পুনরায় কবে সেই ভাগ্য হইবে, যখন দূর হইতেও আপনার প্রসঙ্গ শুনিয়া অল্পস্থান করিতে পারিব? শ্রীকৃষ্ণাবন দাসাদির শুভ চিন্তন করি; শ্রীগোপাল দাস প্রভৃতির শুভ চিন্তন করি। ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেয়।

টীকা: ভক্তিরত্নাকরে ( পৃ. ১০৩৩-৩৪ ) আছে যে, শ্রামদাস শ্রীব্যাস আচার্য্যের পুত্র।

কৃষ্ণাবনদাস শ্রীনিবাসের নন্দন।

আদি স্বন্ধে জানো তাঁর ভ্রাতা ভগ্নীগণ।

বীর হাঙ্গীরের পুত্র শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীজীব গোস্বামী দত্ত এ নাম প্রকাশ।

শ্রীধাড়ি হাঙ্গীর নাম সর্বত্র প্রচার।

শ্রীজীব গোস্বামী শুভ চিন্তে এ সত্তার।

এই পত্রখানি ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল; কেননা, ইহাতে ‘সম্প্রতি উত্তর গোপালচন্দ্র লিখিত হইয়াছে’ এই কথা আছে।

পত্রে উল্লিখিত দুর্গমসদমনী শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরসায়ত সিদ্ধুর শ্রীজীবরচিত টীকার নাম। বৈষ্ণবতোষণী বলিতে এখানে শ্রীজীবকৃত লঘুবৈষ্ণবতোষণী বুঝাইতেছে। উহা ১৫০৪ শকে বা ১৫৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তৃতীয় পত্রখানি রামচন্দ্র কবিরাজ, নরোত্তম দাস ও গোবিন্দ দাসকে সম্বোধন করিয়া শ্রীজীব লিখিয়াছেন। এই পত্রে তিনি সাধনার রীতি সম্বন্ধে আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ লইতে বলিয়া লিখিয়াছেন যে—“তিনি আমার সর্বস্বই।” চতুর্থ পত্রে গোবিন্দদাস কবিরাজকে লিখিত। উহার এক স্থানে আছে—“শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামীর জন্ত পূর্বে শ্রামদাস মুদদবাদকের হাতে বৃহত্তাগবতামৃত পাঠানো হইয়াছে; তাহা সেখানে পৌছাইল কি না, তাহা লিখিয়া আমার চিন্তা দূর করিবেন।” পত্রকয়খানির সর্বত্র শ্রীনিবাসকে বন্ধুভাবে ও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীজীব দেখিয়াছেন। কর্ণপুর কবিরাজের স্মৃচকেও বন্ধুত্বের কথা আছে।

পত্রগুলির অকৃত্রিমতায় সন্নিহান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধামাধব তর্কতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলিতে “গোস্বামীদের রচিত যে সকল গ্রন্থ লোকমারফৎ প্রেরিত বা প্রেরিতব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলিকে বাদ দিলে গোস্বামীদের রচিত অপরগুলির মূল্য নিতান্ত অল্প হইয়া যায়। এই গ্রন্থগুলিকে বাদ দিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রচারযোগ্য গ্রন্থ নাই

বলিলেই চলে।” এ কথা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। শ্রীনিবাস প্রথম বারে নিম্নলিখিত গ্রন্থ বৃন্দাবন হইতে আনিয়াছিলেন বলা যায়—১. উজ্জলনীলমণি, ২. ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, ৩. হরিতত্ত্ববিলাস, ৪. লীলাস্বয়ং, ৫. বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টাকা, ৬. দানকেলিকৌমুদী, ৭. বিদগ্ধমাধব, ৮. ললিতমাধব, ৯. লঘুভাগবতামৃত, ১০. স্তবমালা, ১১. হংসদূত, ১২. উদ্ধবসন্দেশ, ১৩. পদ্মাবলী, ১৪. নাটকচন্দ্রিকা, ১৫. মধুরামহিমা, ১৬. গীতারলী, ১৭. কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, ১৮. বৃহৎ ও লঘু রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদ্বীপিকা, ১৯. প্রমুখাখ্যাতচন্দ্রিকা, ২০. রথুনাথদাসকৃত দানকেলিচিন্তামণি, ২১. স্তবাবলী, ২২. মুক্তাচরিত্র এবং ২৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত গোবিন্দলীলামৃত। ভালপাতায় লিখিত এই গ্রন্থগুলি চারি জনের বহনযোগ্য ভার অনায়াসেই হয়। আমার পাশের বাড়ীর এক বন্ধু আমার নিকট কেবলমাত্র হরিতত্ত্ববিলাস ও গোপালচম্পু চাহিতে আসিবার সময় লোক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন এবং দুই জনে সাত খণ্ড গ্রন্থ কষ্টের সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পত্রকল্পখানিতে একমাত্র বৃহত্তাগবতামৃত ছাড়া আর যে সব গ্রন্থের নাম আছে, সেগুলির প্রত্যেকখানি শ্রীজীবের রচনা। কোন কারণে প্রথম বারে শ্রীনিবাস বৃহত্তাগবতামৃত আনিতে পারেন নাই। তর্কতীর্থ মহাশয় পত্রগুলিতে তিথি ও মাসের উল্লেখ দেখিয়া ও সন-সালের উল্লেখ না পাইয়া উহাদিগকে জাল বলিয়াছেন। এ কালের অনেক পণ্ডিতও সাল উল্লেখ না করিয়া শুধু মাস ও তারিখ লিখিয়া থাকেন। শ্রীজীব ষাঠাদের জন্ম পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সাল জানিতেনই বুঝিয়া তিনি উহার উল্লেখ করা নিশ্চয়োজ্ঞান মনে করিয়াছিলেন। তর্কতীর্থ মহাশয় অনেক কিছুকেই মিথ্যা ও জাল বলিয়াছেন। শ্রীনিবাসের জন্ম ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার নিকটবর্তী কালে প্রমাণ করিবার জন্ত তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে যে, শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টের শিষ্য নহেন এবং যে পদে শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উহা জাল (*Our Heritage*, vol. II, pt. I, 1954, পৃ. ২০১)। শ্রীনিবাসের পুত্র গোবিন্দগতি স্বয়ং তাঁহার পিতাকে গোপাল ভট্টের শিষ্য বলিয়াছেন (কর্ণানন্দ উদ্ধৃত শ্লোক, পৃ. ৮); কর্ণপুর কবিরাজ (সূচক, শ্লোকসংখ্যা ৪৩-৪৪), মনোহর দাস অম্বরাগবলীতে, ভক্তিরসাকর ও নরোত্তমবিলাসে নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি সকলে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

কর্ণানন্দ যদি সত্যই ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, তবে সে সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্রের তিন পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ, স্বন্দরানন্দ ও শ্রীহরি ঠাকুর “ভক্তশূর” (পৃ. ২৮) হইতে পারেন কি না, তাহা বিচার্য্য। পূর্বে বলিয়াছি যে, শ্রীনিবাস আনুমানিক ১৫১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করেন। ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যদি গতি-গোবিন্দের জন্ম হয়, তাহা হইলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তিনটি পুত্র হওয়া কিছু অসম্ভব নহে।

কর্ণপুর কবিরাজের সূচকে (৭৪. শ্লোক), অম্বরাগবলীতে (পৃ. ৩৭) দেখা যায় যে, শ্রীনিবাস প্রথম বার বৃন্দাবন হইতে আসিয়া রামচন্দ্র কবিরাজকে শিষ্য করেন। তার পর

দ্বিতীয় বারে বৃন্দাবন হইতে রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে কিরিয়া আসিয়া বীর হাখীর ও গোবিন্দদাস কবিরাজকে শিষ্য করেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ খ্রীষ্টচতুস্তের কৃপাপাত্র চিরঞ্জীব সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। হুতরাং তাঁহার জন্ম মহাপ্রভুর তিরোধানের অল্প পরেই হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাঁহার যখন দীক্ষা হয়, তখন তাঁহার পুত্র দ্বিব্যাসিংহ বেশ বড় হইরাছেন। প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থে দেখা যায় যে, দ্বিব্যাসিংহই খ্রীনিবাসকে গ্রামের প্রাপ্ত হইতে অভিযর্থনা করিয়া আনিয়াছিলেন। হুতরাং গোবিন্দদাসের বয়স তখন চল্লিশ বৎসরের কাছাকাছি। তিনি যদি ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়স হয় ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময়ের কাছাকাছিই খ্রীনিবাস দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করেন। গোবিন্দদাস দুইটি পদে প্রতাপাদিত্যের নাম কবিয়াছেন। যশোহরের প্রতাপাদিত্য ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রাজা হন ও ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পতন হয় (*History of Bengal*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৪)।

পুলিনবিহারী দাস মহাশয় “বৃন্দাবনকথা”য় লিখিয়াছেন যে, তিনি খ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধরদের গৃহে রক্ষিত পুণ্ড্র হইতে আনিয়াছেন যে; খ্রীনিবাস ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে তিরোহিত হন। এই ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তে প্রায় মিলিয়া যাইতেছে।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খ্রীনিবাসের অপেক্ষা বয়সে অল্পতঃ ১৪।১৫ বৎসরের ছোট ছিলেন। কেননা, খ্রীষ্টচতুস্তের তিরোভাবের পর তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া প্রবাদ। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীনিবাস যখন প্রথম বার শ্রীবৃন্দাবন যান, তখন নরোত্তম ঠাকুর লোকনাথ-প্রোত্মার নিকট দীক্ষা লইয়া গুরুর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কর্ণপুর কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, লোকনাথের কুঞ্জে যখন খ্রীনিবাসের সঙ্গে নরোত্তমের পরিচয় হয়, তখন খ্রীনিবাস বলেন, বিধাতা আজ আমাকে কি নয়নই দিলেন, না নেত্রাচ্ছাদক পদ্মই দিলেন? অথবা আমাকে মনই দিলেন, না বহুমূল্য রত্ন দিলেন? অথবা আমাকে প্রাণই দিয়াছেন কি? (৪৭)। কর্ণপুর কবিরাজের মতে নরোত্তম খ্রীনিবাসের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে গোড়ে করেন নাই, তাহা পূর্বেই ৬৩ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। নরোত্তম ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরও কিছুকাল বৃন্দাবনে ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন হইতে কিরিবার পূর্বেই হয়তো রামচন্দ্র কবিরাজ খ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; কেননা, কর্ণপুর কবিরাজ বলেন যে, খ্রীনিবাস রামচন্দ্র কবিরাজকে গোত্মামি-গ্রন্থ পড়াইয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, বৃন্দাবনে তোমার তুল্য এক চক্ষু বিধাতা আমাকে পূর্বে দিয়াছিলেন, বহুদিন আমি একচক্ষুই ছিলাম; আজ বিধাতা আবার তোমাকে দিয়া আমাকে আর এক চক্ষু প্রদান করিলেন (৭৮)।

এই শ্লোকটির প্রতিধ্বনি অম্বরাগবদ্বীতে পাওয়া যায়—

বৃন্দাবনে তোমা সম পাওল এক লোচন ।

একাক্ষি হইয়া আমি দিলাম বহুদিন ।

অন্য দ্বিতীয়াক্ষি দিল বিধি সুপ্রবীণ ॥ ( পৃ. ৩৮ )

এইরূপ অল্পবাদ কর্ণপূর্ব কবিরাজের স্মৃচকের প্রামাণিকতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অল্পরাগবল্লীতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, শ্রীনিবাসের নিকট রামচন্দ্র কবিরাজের দাক্ষ্য হইবার পর তাঁহার সহিত নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বন্ধুত্ব হয়—

আচার্য্য ঠাকুরের শিষ্য বড় কবিরাজ ঠাকুর ।

তাঁহার সহিত শ্রীতি বাটিল প্রচুর ॥ ( পৃ. ৩৭ )

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীৰ্ত্তনের নূতন পদ্ধতি স্থাপন করেন। তিনি খেতুরীতে কাস্তনী পূর্ণিমা তিথিতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং সেই উপলক্ষ্যে তৎকালীন সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভক্তকে একত্রিত করেন। খেতুরীর এই উৎসবে বৃন্দাবনের ভজন-প্রণালীর সঙ্গে গোড়ের গৌরাজ-পারম্যবাদের সামঞ্জস্য (synthesis) স্থাপিত ও ঘোষিত হয়। রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে গৌরাজ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরাজের মূর্তি পূজার কোন বিবরণ আমরা পাই না। এই উৎসবে গোবিন্দ কবিরাজ অতিথি-পরিচর্য্যার ভার লইয়াছিলেন বলিয়া নরোত্তমবিলাসে লিখিত আছে ( পঞ্চম বিলাস )। স্মরণ্য এই উৎসব ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে অহুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বেশী পরে নহে। কেননা, উৎসবে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের পরিকরদের মধ্যে নরহরি সরকারের ভ্রাতৃপুত্র রঘুনন্দন, অষ্টদেবের পুত্র অচ্যুতানন্দ, শ্রীনিবাসের ভ্রাতা শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, নিত্যানন্দের পার্শ্ব রঘুপতি উপাধ্যায়, মীনকেতন রামদাস, কান্হু পণ্ডিত, বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাস প্রভৃতি ও নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবী দেবী উপস্থিত ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি ছিল এবং সেই কথা নরহরি চক্রবর্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দুই চারিটি নামের সম্বন্ধে তাঁহার ভুল হইতে পারে, কিন্তু কাটোয়া-মহোৎসবে ষাঁহার উপস্থিত ছিলেন বলিয়া তিনি ভক্তিরত্নাকারে লিখিয়াছেন ও খেতুরীতে উপস্থিত মহাজনবর্গের যে তালিকা নরোত্তমবিলাসে দিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকিয়া পারে না। ১৫৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দের পরে খেতুরীর উৎসব হইলে অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দ, ষাঁহার বয়স ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ বৎসর ছিল বলিয়া বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে উপস্থিত থাকা কঠিন হয়।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদেই রচিত হইয়াছিল। কেননা, সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৪ সংখ্যক প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার পুথির লিপিকাল ১০০২ সাল অর্থাৎ ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ সাল মল্লান্দ নহে। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও পুথির অক্ষর দেখিয়া উহা ৩৫০ বৎসরের প্রাচীন বলিলেন। পুথিখানি আমি মুদ্রিত পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছি যে, বহু স্থানেই পাঠান্তর, কোন কোন স্থানে মূল্যবান পাঠান্তর আছে। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে যে

পুঁথি নকল হইয়াছিল, তাহা অঙ্কিত: ১৫।২০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল ধরা যাইতে পারে।

ড. স্কুমার সেন তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে (পৃ. ৪৩৬, পাদটীকায়) লিখিয়াছেন যে, নবোত্তম প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় চৈতন্যচরিতামৃতের স্তায্য প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ,                      রসিক ভকতমাক,  
যেহৌ কৈল চৈতন্যচরিত।

গৌরগোবিন্দলীলা,                      শুনিতে গলয়ে শিলা,

তাহে না জন্মিল মোর প্রীত ॥

এই ত্রিপদী যদি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় থাকিত, তাহা হইলে উহা ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইতে পারিত না। কেননা, চৈতন্যচরিতামৃত ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের রচনা।<sup>১</sup> আমরা মুদ্রিত কোন প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় এবং সাহিত্য-পরিষদের ২৩০৪,

১. ড. স্কুমার সেন তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে (পৃ. ৩৩৭, পাদটীকা) পার্টনা শ্রীগৌরানন্দমঠের অধিকারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামীর চরিতামৃতের পুঁথির উল্লেখ করিয়া মানিয়া লইয়াছেন যে, ঐ পুঁথিখানি ১০২০ সাল বা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের লেখা। পুঁথিখানি পার্টনার গুলজারবাগের অন্তর্গত গাইঘাট মন্দিরে আছে। উহার কাগজ বা হাতের লেখা দেখিয়া মনে হয় না যে, উহা প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের প্রাচীন। সালটি মল্লান হইতে পারে। যদি তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়া যায় যে, উহা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দেব অল্পলিপি, তাহা হইলেও চরিতামৃত রচনার কাল ১৬১২—যাহা আমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১৬১৫র বিকল্পে নির্দেশ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে পারে এবং এক বৎসর পর উহা নকল করা হইতে পারে। কিন্তু ৩৫০ বৎসরের প্রাচীন কাগজের চেহারা ঐ পুঁথিতে দেখা যায় না। স্কুমারবাবু বলেন যে, উত্তরবঙ্গের সমাপ্তিকাল ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দ মানিয়া লইলেও চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দের পরে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। কিন্তু চরিতামৃতে যে ভাবে গোবিন্দের সেবার কথা উল্লেখ আছে, তাহাতে মনে না করিয়া পারা যায় না যে, ঐ সেবা ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ-নির্মিত মন্দিরের সেবা (Growse, *History of Mathura*, পৃ. ১৪৫; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪৫।৪, পৃ. ২১১-১২, ডাঃ কালিকারঞ্জন কাছনগোঁর প্রবন্ধ)—

বৃন্দাবন কল্পক্রমে স্ববর্ণ-সদন।

মহাযোগপীঠ তাহা বস্ত্র-সিংহাসন ॥

তাতে বসি আছে সাক্ষাৎ ব্রজেননন্দন।

শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥

রাজসেবা হয় তাহা বিচিত্র প্রকার।

দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার ॥

১৩৭২ হইতে ১৩৮৩, ২০২২ হইতে ২০৩১, এবং ২৩৩৫ সংখ্যক পুঁথি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া ঐ ত্রিপদী পাইলাম না। কিন্তু উহা প্রার্থনার দ্বিতীয় পদরূপে গৌরবিনোদ গোস্বামীর সংস্করণে এবং সাহিত্য-পরিষদের ৪২৫, ৪২৭ সংখ্যক পুঁথিতে এবং ৪২৬ ও ১৩৫২ সংখ্যক পুঁথির দশম পদরূপে পাইয়াছি। প্রার্থনার পদগুলি এক-এক পুঁথিতে এক-এক রকম। মনে হয়, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি পদ লিখিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে পদগুলি সাজাইয়া প্রার্থনার পদরূপে ব্যবহার করিয়াছেন ও করিতেছেন। যাহা হউক, প্রার্থনার পদ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নরোত্তম ঠাকুর শুধু চরিতামৃত রচনার পরে নহে, পরন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোত্তাবেরও কিছু পরেও জীবিত ছিলেন। কেননা, সাহিত্য-পরিষদের ১৩৫২ সংখ্যক পুঁথির ২৫ সংখ্যক পদে (গৌরবিনোদ গোস্বামী সংস্করণের ১৫) আছে—

কাঁহা মোর ভট্টকুল কাঁহা কবিরাজ।

শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের কবি-শিষ্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাড়ে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত রচনাকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বল্লভদাস—শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস কবিরাজের তিরোত্তানের পরেও জীবিত ছিলেন। তিনি পদকল্পতরুতে ২০৮৩ সংখ্যক পদে বলিয়াছেন যে—

উচ্ছিষ্টের কুঁকুর মুঞি আছিলুঁ সেখানে।

যখন বে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে।

শুনিতো স্বপন হেন কহিতে কহো কথা।

ভিটা সোন্দরিয়া কুঁকুর কাদে এমতি আছো এথা।

অন্ত একটি পদে (২০৮১) তিনি লিখিয়াছেন—

গোরা-শুণে আছিল ঠাকুর শ্রীনিবাস।

নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দদাস।

একুই কালে কোথা গেল দেখিতে না পাই।

ধাক্কু দেখিবার কাজ শুনিতো না পাই।

শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র কিছু আগে অগ্রকট হইয়াছেন বলিয়া নরোত্তম ঠাকুর বিলাপ করিয়া (নরোত্তমবিলাস, একাদশ বিলাস) পদ রচনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের (১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ) কিছু পরেও জীবিত ছিলেন— তাহা তাঁহার

সহস্র সেবক সেবা করে অহঙ্কণ।

সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন।

সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিনাস।

তাঁর যশ শুণ সর্বজগতে প্রকাশ ॥ ১৮

একটি পদের ভগিতায় প্রথমে প্রতাপাদিত্যের নাম ও পরে সেই পদেই রায় বসন্তের নাম উল্লেখ করাতে বুঝা যায়। সুতরাং তিনি অঙ্কতঃ ১৬১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন ধরা যায়। হয়ত তাঁহার ও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের তিরোধান প্রায় একই সময় হইয়াছিল বলিয়া বঙ্গভদ্রাস “একুই কালৈ কোথা গেল” বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের খ্যাতি সপ্তদশ শতকের প্রথম অর্ধেই বৃন্দাবনেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে হরিদাস পণ্ডিতের আদেশ লইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (চৈ. চ. ১৮, ২১২), তাঁহার শিষ্য ও গোবিন্দের সেবাসিকারী রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার “সাধনদীপিকা”য় নরোত্তমের “ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র” ইত্যাদি প্রাৰ্থনার পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১২৭)। গোবিন্দ কবিরাজের “নীলাচলে কনকচল গোরা” ইত্যাদি পদও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিবন্ধাকরে দ্বাদশ বার সাধনদীপিকার প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

# শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব বিষয়ে বাস্তু ঘোষের পদ

শ্রীমালবিকা চাকী

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব লইয়া সংস্কৃতে বা বাংলায় কোন সমসাময়িক কবি বা ভক্তের কোন বিলাপ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ছাড়া অন্য কোন চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের বিষয়ে কোন ইঙ্গিত নাই, উল্লেখ তো দূরের কথা। আমি বাস্তু ঘোষের পদাবলী সংকলন প্রসঙ্গে এই বিষয়ে কয়েকটি পদের সম্ভান পাইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৮ সংখ্যক পুথির ৬৭ সংখ্যক পদটি এই—

অপসর নাহি মোর নয়নের জল।  
গোরা বিহু প্রাণ মোর সদাই বিকল।  
সেই ধন সেই প্রাণ সেই সব স্থল।  
গোরা বিহু লাগে মোর বকড় স্কল।  
সংকীর্ণনময় গোরা গোলোকের সার।  
তাহাতে না রহে মন দেহ ভেল ভার।  
কি করিব কোথা যাব বচন না সরে।  
হারাইছ গোরাচাঁদ গোপীনাথের ঘরে।  
কহে বাস্তুদেব ঘোষ হইয়া কাতর।  
গৌর অম্বরূপে মোর হিয়া জর জব।

বাস্তু ঘোষ এখানে বলিতেছেন যে, 'গোপীনাথের ঘরে' অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিত-সেবিত টোটা গোপীনাথের মন্দিরে প্রভু অস্তর্ধান করিলেন। এই উক্তির সমর্থন জয়ানন্দের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' হইতে পাওয়া যায়। জয়ানন্দ অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা আলো-আধারি ভাষায় লিখিয়াছেন। তিনি বলেন—

“নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাগ্রামে।  
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে।  
আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অষ্টমীকাব করি।  
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী ॥...  
আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।  
ইটালি বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে।  
চরণে বেদনা বড় যষ্টীর দিবসে।  
সেই লক্ষ্যে টোটার শয়ন অবশেষে।  
পণ্ডিত গোস্বামিকে কহিল সর্বকথা।  
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা ॥” (পৃ. ১৫০)

‘দশ দণ্ড রাজে’ মানে—চার ঘণ্টা রাজি অর্থাৎ রাজি এগারোটা আন্দাজ সময়, ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে ২২ জুলাই তারিখে প্রভু লীলা সম্বরণ করেন (খ্রীষ্টচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ২৩)। বাহুদেব ঘোষ ঘেখানে ‘গোপীনাথের ঘরে’ লিখিয়াছেন, সেইখানে জ্ঞানানন্দ শুধু ‘টোটার’ ও ‘পণ্ডিত গোসাঞি’ অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিতের নিকট লিখিয়াছেন।

এই দুইটি সংবাদ একত্র করিয়া পড়িলে মানে এই দাঁড়ায় যে, আষাঢ় মাসের রথযাত্রার দিনে অর্থাৎ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে খ্রীষ্টচৈতন্য যখন রথের অগ্রে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন সহসা তাঁহার পায়ে ইটের আঘাত লাগে। তাহার ফলে হয়ত তাঁহার অঙ্গ হইয়াছিল। তিনি তাহা অগ্রাহ করেন। কিন্তু যজ্ঞীর দিন ব্যথা খুব বেশী বৃদ্ধি পায়। সেই সময় তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু গদাধর পণ্ডিত তাঁহাকে গম্ভীবা হইতে অনেকের কাছে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে লইয়া গিয়াছিলেন।

এই দুই বিবরণের সহিত লোচনের উক্তির কিছু অসামঞ্জস্য আছে। লোচনও স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রভু আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে তিরোধান করেন। কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত স্থান ও কালের পরিচয় বাহুদেব ঘোষ ও জ্ঞানানন্দের বিবরণ হইতে পৃথক্। লোচন লিখিয়াছেন—

“আষাঢ় মাসের তিনি সপ্তমী দিবসে ।  
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃখাসে ।  
সত্য ত্রেতা ছাপর সে কলি যুগ আর ।  
বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্ণন সার ॥  
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন ।  
কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ ॥  
এ বোল বলিয়া সেই দ্বিজগতরায় ।  
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায় ॥  
তৃতীয় গ্রহর বেলা রবিবার দিনে ।  
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আগনে ॥

—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, পৃ. ১১৬-১১৭

বাহুদেব খ্রীষ্টচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সঙ্গী; আব জ্ঞানানন্দের পিতা ও জ্ঞানানন্দ স্বয়ং গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। সুতরাং এই দুই সমসাময়িকের বিবরণ অগ্রাহ করিয়া লোচনের কথা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন কারণ দেখি না।

বাহুদেবের উল্লিখিত পদটি সংকীর্ণনামৃত, পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি কোন সংকলনগ্রন্থে স্থান পায় নাই। তাহার কারণ প্রথমতঃ বোধ হয় এই যে, ভক্তগণ প্রভুর তিরোধানের কথা বলিতে অপরিগম্য হুঃখ বোধ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণলীলার স্তায় গোবাকলীলাও নিত্যলীলা। বৃন্দাবনদাস বার বার বলিয়াছেন—

এ সব লীলার কভো নাহি পরিচ্ছেদ ।

আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ ।

—চৈতন্যভাগবত

সেই ভক্ত তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব সম্বন্ধে প্রায় নীরবই রহিয়া গিয়াছেন ।

একখানি প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ও তাঁহার অন্তরঙ্গ সহচর গদাধর ও নরহরি সরকারের তিরোধানে বাসু ঘোষের বিলাপসূচক পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । গ্রন্থখানি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য, রাধাকৃষ্ণ গোস্বামীর রচনা । কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ হরিদাস পণ্ডিতের আদেশ লইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন । যথা—

পাঞা যঁর আচ্ছাধন, ব্রজে বৈষ্ণবগণ

বন্দো তাঁর মুখ্য হরিদাস ।

—চৈ. চ. ২।১২

গ্রন্থখানির নাম ‘সাধনদীপিকা’ । উহাতে এই পদটি আছে—

গৌরাকবিরহজ্বরে হিয়া ছটফট করে

জীবনে না বাঁধয়ে থেহা ।

না হেরিয়া চাঁদমুখ বিদরিতে চাহে বুক

কেমনে করিতে চাহে নেহা ॥

প্রাণের হরি ! কহ মোরে জীবন উপায় ।

এ হুখে হুখিত যে এ হুখ জানিয়ে সে

আর আমি নিবেদিব কায় ॥

গৌরাক-মুখের হাসি স্মৃখা খসে রাশি রাশি

তাহা আমি না পাই দেখিতে ।

যত ছিল বন্ধুগণ সন্তে ভেল নিকরূপ

আমি জীয়ে কি হুখ খাইতে ॥

গদাধর আদি করি না দেখিয়া প্রাণে মরি

মইলু মইলু মধুমতী না দেখিয়া ।

যে মোরে করিত দয়া সে গেল নিষ্ঠুর হয়

বাসু কেনে না গেল মরিয়া ॥

—সাধনদীপিকা, পৃ ১৭৭

সমস্ত বন্ধুগণ নিকরূপ হইল মানে, তাঁহারা সকলেই অন্তর্ধান করিয়াছেন । মধুমতী বলিতে নরহরি সরকার ঠাকুরকে বুঝায় ; কেননা, ‘গৌরগণোদ্দেশদীপিকা’তে তাঁহাকে মধুমতীর তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । মনে হয়, এই পদটি বিশেষ করিয়া নরহরি সরকারের তিরোধানের পর কবি লিখিয়াছিলেন । নরহরি সরকারের সহিত তাঁহার বিশেষ

ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাসু ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ একটি পদে (ভক্তিরত্নাকর, ২১২ পৃ. পদকল্পতরু, ২১২৮) লিখিয়াছেন—

বাসু ঘোষ রামানন্দ      শ্রীবাস জগদানন্দ  
নাচে পছঁ নরহরি সঙ্গে ।

শিবানন্দ সেনও একটি পদে লিখিয়াছেন (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ২৪৪, সাধনদীপিকা, পৃ. ১২৬)—

ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে ।  
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে ॥

নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর বহুদিন জীবিত ছিলেন। তাঁহার বিরোধে বাসু ঘোষের মনে শ্রীচৈতন্যের বিরহব্যথা আবার নূতন করিয়া জাগিয়াছিল। তাই তিনি উল্লিখিত পদটি লিখিয়াছিলেন। আমি ঐ পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৮ সংখ্যক পুথিতেও (৬৪ সংখ্যক পদ) পাইয়াছি। ‘সাধনদীপিকা’র পাঠের সহিত তাহার সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। যেমন—‘ষে মোরে করিত দয়া’ স্থানে ‘আমারে করিত দয়া’ আছে।

হরি হরি গোরা কোথা গেল ।

মরমে পশিল শেল বাহির না হইল ॥

ইত্যাদি পদটিও (পদকল্পতরু, ১৮৫৬) শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর বাসু ঘোষ লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কেননা, উহার শেষে আছে—

গদাধর দামোদর কেমনে বাঁচিবে ।

এত দিনে বাসু ঘোষ পরাণে মরিবে ॥

এ ধরণের কথা নিমাইয়ের সম্মান গ্রহণের পর লিখিত হইতে পারে না। নিমাইয়ের নবদ্বীপ ত্যাগের কিছুকাল পরই গদাধর কাটোয়ায় চৈতন্যের নিকট গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

অবধূতচন্দ্র গদাধর শ্রীমুকুন্দ ।

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য আর ব্রহ্মানন্দ ॥

আইলেন প্রভু যথা কেশব ভারতী ।

মত্ত সিংহ প্রায় প্রিয়বর্গের সঙ্গতি ॥

—চৈ. ভা. ২।২৬

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে দামোদর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের সম্মান গ্রহণের পর তাঁহার সহিত শান্তিপুর হইতে পুরী গিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।৭।৩২)। সুতরাং এই সময়ে ‘দামোদর কেমনে বাঁচিবে’ বলার কোন সার্থকতা থাকে না।

শ্রীগোবিন্দের তিরোভাব বিষয়ে বাসু ঘোষের আর একটি পদ সংকীর্ণনামৃত (পদসংখ্যা ৪০২) ও পদকল্পতরুতে (পদসংখ্যা ৪৫১) পাওয়া যায়।

মঝু মনে লাগল শেল ।

গৌর বৈমুখ হৈ গেল ॥

জনম বিফল মোর ভেল ।  
 দ্বারক বিহি দুখ দেল ॥  
 কাহে কহব ইহ দুখ ।  
 কহইতে বিদরয়ে বুক ॥  
 আর না হেরব গোরামুখ ।  
 অব জীযন্তে কিম্বে সুখ ॥  
 বাসুদেব ঘোষ রস গান ।  
 গোরা বিহু না রহে পরাণ ॥

এই পদটি ‘পদকল্পতরু’তে কলহাস্তরিতার গৌরচন্দ্রিকারূপে দেওয়া হইয়াছে। ‘গৌর বৈমুখ ভৈ গেল’ বাক্যটির আপাতদৃষ্টিতে এই অর্থ মনে হয় যে, গৌরাক্ষ অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু ইহা যদি কেবল সাময়িক অভিমানেবশে প্রভুর চলিয়া যাওয়া হইত, তাহা হইলে ‘আর না হেরব গোরামুখ’ বলার কোন সার্থকতা থাকিত না। এটি প্রভুর তিরোধানের পর বিলাপের পদ। তাই কবি বলিতেছেন যে, গোরার মুখই যদি আর না দেখিতে পাই, তাহা হইলে বাঁচিয়া কি সুখ? আর সুখের কথা ছাড়িয়া দিলেও গোরার অভাবে প্রাণ বাঁচানই অসম্ভব—‘গোরা বিহু না রহে পরাণ ॥’

# সরলা দেবী চৌধুরাণীর রচনাপঞ্জী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সাহিত্যসাধনায় ও সাময়িক পত্র সম্পাদনের সরলা দেবী ( পরে সরলা দেবী চৌধুরাণী ) বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । ‘ভারতী’র অন্ততম সম্পাদিকারূপে তিনি সুধী-সমাজে পরিচিত । কৈশোবাবধি তাঁহার বহু রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় । ভারতীতে প্রকাশিত তাঁহার রচনাসমূহ এক সময়ে জাতীয় জীবনে বিশেষ বলসঞ্চার করিয়াছে । এই সকল পত্রিকার যতগুলি আমি পাইয়াছি তাহা হইতে সরলা দেবীর রচনাসমূহের একটি তালিকা এখানে প্রকাশ করিলাম । এই তালিকায় অসম্পূর্ণতা থাকিলেও ইহার দ্বারা বিবিধ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে এইরূপ ভরসা করি । এই সকল রচনার অতি সামান্যই ইতিপূর্বে পুস্তকাকারে প্রণীত হইয়াছে । সরলা দেবীও নিজ রচনাসমূহ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

“আমার লেখা-কুমারীরা মাসিকে সাপ্তাহিকে দৈনিকে ছাপাখন্দরী হয়েছে কিন্তু গ্রন্থের ঘরবী হয় নি— মাত্র গুরুদাস চাটুধ্যে কোম্পানীর আট আনাব এডিশনে ছাপান ‘নববর্ষের স্বপ্ন’ নামে কতকগুলি ছোট গল্প, বড় বড় সভা-সমিতিতে ভাষিত ইংরেজী ও বাংলা বক্তৃতা, ‘বন্ধের বীর’ সিরিজের দুখানি পুস্তিকা ও ইদানীংকার দুয়েকটি আধ্যাত্মিক বিষয়ের বই ছাড়া।”

যতদূর সম্ভব কালাত্মকভাবে প্রকাশকাল, পত্রিকার নাম এবং রচনার নাম নিম্নে দেওয়া হইল । সরলা দেবীর কৃত স্বলিপি অনেকগুলিই তাঁহার ‘শতগান’ গ্রন্থে মুদ্রিত আছে—এই তালিকায় সাধারণতঃ সেগুলির উল্লেখ করা হয় নাই ।

| সাল     | পত্রিকা      | রচনা                                                                     |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ১৮৮৫    |              |                                                                          |
| নবেম্বর | সখা          | পিতামাতার প্রতি কিরূপ প্রবন্ধ । পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যবহার করা কর্তব্য রচনা |
| ১২০২    |              |                                                                          |
| জ্যৈষ্ঠ | বালক         | হুর্ভিক্ষ প্রবন্ধ । ‘বালিকার রচনা’                                       |
| কার্তিক |              | বাবলা গাছের কথা                                                          |
| ১২০৪    |              |                                                                          |
| জ্যৈষ্ঠ | ভারতী ও বালক | বকুলের গল্প                                                              |
| ১২০৬    |              |                                                                          |
| জ্যৈষ্ঠ |              | কুড়ান                                                                   |

| সাল            | পত্রিকা      | রচনা                                      |
|----------------|--------------|-------------------------------------------|
| ১২৯৮           | ভারতী ও বালক |                                           |
| আষাঢ়          |              | প্রেমিক সভা                               |
| কার্তিক        |              | প্রবাসীর ছ'চার কথা                        |
| পৌষ            |              | স্বরেশের উপহার                            |
| পৌষ,           |              |                                           |
| ফাল্গুন, চৈত্র |              | মালবিকা-অগ্নিমিত্র                        |
| ১২৯৯           |              |                                           |
| বৈশাখ          |              | রতিবিলাপ                                  |
|                |              | স্বরলিপি আলোচনা                           |
|                |              | সংস্কৃত গান                               |
| জ্যৈষ্ঠ        |              | সম্পাদকের চিত্রচয়ন। জাপানী উপাখ্যান      |
|                |              | মালতীমাধব                                 |
| আষাঢ়          |              | সম্পাদকের চিত্রচয়ন। জাপানী প্রহসন        |
|                |              | মালতীমাধব সহস্র প্রমোত্তর <sup>১</sup>    |
|                |              | মহীশূরী গান। স্বরলিপি সহ                  |
| শ্রাবণ         |              | সম্পাদকের চিত্রচয়ন। পিয়ের লোট           |
|                |              | বাঙ্গালী ও মারহাট্ট                       |
| ভাদ্র          |              | ব্রাউনিংয়ের একটি কবিতা                   |
| আশ্বিন         |              | তত্ত্বস্তর <sup>২</sup>                   |
|                |              | নৃতন ধরণের উপস্থাপন                       |
|                |              | নববর্ষের স্বপ্ন।                          |
| অগ্রহায়ণ,     |              |                                           |
| মাঘ, চৈত্র     |              | মালতীমাধব                                 |
| মাঘ            |              | বেদগানের স্বরলিপি                         |
| ১৩০০           | ভারতী        |                                           |
| বৈশাখ          |              | নববর্ষের স্বপ্ন                           |
| আষাঢ়          |              | ভালবাসা না চকুলজ্জা ?                     |
| আশ্বিন         |              | বাণী। গল্প                                |
|                |              | বন্দে মাতবং। প্রথম ছয় কলির স্বরলিপি      |
| কার্তিক, মাঘ   |              | আলোচনা। “ভাষা” শীর্ষক প্রবন্ধ লইয়া সূচনা |

১. লেখিকা ও হেমসুন্দর রায়

২. হেমসুন্দর রায়ের প্রত্যুত্তর

| সাল  | পত্রিকা                                                         | রচনা                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১৩০০ | ভারতী                                                           | বান্ধলা রত্নভূমি<br>বান্ধলা অ্যাকাডেমি<br>বন্ধিমবাবু                                                        |
| ১৩০১ | বৈশাখ<br>বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ,<br>শ্রাবণ, চৈত্র<br>জ্যৈষ্ঠ<br>ফাল্গুন | অশ্ব পুষ্ঠে<br>লান্‌করানের উজ্জীর। নাটক, পারশ্ব হইতে অম্ববাদ<br>মুজারাক্স<br>বান্ধলার হাসির গান ও তাহার কবি |
| ১৩০২ | জ্যৈষ্ঠ<br>আষাঢ়<br>শ্রাবণ<br>ভাদ্র<br>আশ্বিন                   | একা। কবিতা<br>নৈনিতালের অপরাধ<br>নারীর প্রতিদ্বন্দ্বি<br>লালন ফকির ও গগন<br>চিত্র দর্শনে                    |
| ১৩০৩ | বৈশাখ<br>চৈত্র                                                  | একালে সেকাল<br>স্বরলিপির ব্যাখ্যা<br>স্বামী বিবেকানন্দ                                                      |
| ১৩০৪ | বৈশাখ<br>জ্যৈষ্ঠ<br>আষাঢ়                                       | গীর্জাঙ্গী<br>প্রত্যাহার<br>অনাথবন্ধু। সমালোচনা<br>জাতীয় মহাসভা ও জাতীয় সঙ্ঘ                              |
| ১৩০৫ | বৈশাখ                                                           | জনশেপের বিলাপ                                                                                               |
| ১৩০৬ | বৈশাখ<br>জ্যৈষ্ঠ<br>আষাঢ়                                       | মৃত্যুচর্চা<br>সাতপুরুষের কমে হিন্দুবিবাহ<br>বোম্বাই সিগ নলারের ধর্মঘট<br>আহিতাশ্রিকা। কবিতা                |

| সাল       | পত্রিকা | রচনা                                                 |
|-----------|---------|------------------------------------------------------|
| ১৩০৬      |         |                                                      |
| ভাদ্র     | ভারতী   | শাস্তিচর্চা                                          |
| কার্তিক   |         | নয়নতারা। গ্রন্থ-সমালোচনা                            |
| মাঘ       |         | দক্ষিণাপথ ভ্রমণ। ঐ                                   |
| ১৩০৭      |         |                                                      |
| বৈশাখ     |         | পারস্য পুলক                                          |
| আশ্বিন    |         | হৃদয়-বাণ। কাবতা                                     |
| পৌষ       |         | ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য। গ্রন্থ-সমালোচনা               |
| মাঘ       |         | ওমর খৈয়াম                                           |
| চৈত্র     |         | ভারতনারীর সত্রাজী। স্বতি                             |
| ১৩০৮      |         |                                                      |
| বৈশাখ     |         | মহারাণীর অশ্বোষ্টি সমারোহ বিলাতে ও ভারতে<br>রুবায়াৎ |
| ১৩০৮      |         |                                                      |
| বৈশাখ     |         | হিমালয়। গ্রন্থ-সমালোচনা                             |
| আবণ       |         | ভাষাতত্ত্ব                                           |
| ১৩০৯      |         |                                                      |
| বৈশাখ     |         | বান্দালী পাড়ায়                                     |
| কার্তিক   |         | বন্দনা। গান                                          |
| ১৩১০      |         |                                                      |
| বৈশাখ     |         | পাষাণের আবেদন। কবিতা                                 |
| জ্যৈষ্ঠ   |         | বান্দালীর পিতৃধন                                     |
| আষাঢ়     |         | বিলাতী ঘুসি বনায়<br>দেশী কিল                        |
| আবণ       |         | কুমার উদয়াদিত্য                                     |
| ভাদ্র     |         | ভারতের হিন্দু ও মুসলমান                              |
| আশ্বিন    |         | বান্দালী পাড়ায়                                     |
| ১৩১১      |         |                                                      |
| জ্যৈষ্ঠ   |         | বান্দালার ইতিহাসের উপকরণ                             |
| ভাদ্র     |         | আমাদের উচ্চশিক্ষা                                    |
| কার্তিক   |         | বীরশ্রমীর গান। কবিতা                                 |
| অগ্রহায়ণ |         | গাইকোয়াড় মহারাজের অভ্যর্থনা সঙ্গীত                 |

| সাল  | পত্রিকা   | রচনা                                                                      |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ১৩১২ | বৈশাখ     | ভারতী                                                                     |
|      |           | আমার বাল্যজীবনী<br>কংগ্রেস ও স্বায়ত্তশাসন<br>খেয়ালের চৌহদ্দি। খেয়ালখাত |
| ১৩১৩ | বৈশাখ     | হিমালয়ে                                                                  |
|      | জ্যৈষ্ঠ   | ব্যাপ্তি                                                                  |
| ১৩১৪ | বৈশাখ     | বারমাসা                                                                   |
| ১৩১৬ | মাঘ       | অভয় মন্ত্র                                                               |
| ১৩১৭ | চৈত্র     | ভারত জ্ঞী-মহামণ্ডল                                                        |
| ১৩১৮ | বৈশাখ     | ষোঁগাষোঁগ                                                                 |
|      | মাঘ       | দিল্লীর দরবার                                                             |
|      | ফাল্গুন   | কবি সম্বন্ধনা                                                             |
| ১৩১৯ | আষাঢ়     | রূপকথার রূপান্তর                                                          |
|      | মাঘ       | কাজের বোঝা। কবিতা                                                         |
|      | ফাল্গুন   | আমার শ্রোতা। কবিতা                                                        |
| ১৩২০ | বৈশাখ     | হিম্মোলা                                                                  |
|      | জ্যৈষ্ঠ   | জাতীয় কাল-বৈশাখ                                                          |
|      | অগ্রহায়ণ | বরফ-গলা। কবিতা<br>বিজয়া দশমী                                             |
| ১৩২৩ | বৈশাখ     | গোড়ায় গাফিলি                                                            |
|      | জ্যৈষ্ঠ   | জয়স্বর                                                                   |
|      | শ্রাবণ    | চিক্রাবলী                                                                 |
|      | ভাদ্র     | পলায়নপর ও পলায়নের পর                                                    |
|      | মাঘ       | বঙ্গীয় সেনরাজগণের উত্তরচরিত                                              |

| সাল         | পত্রিকা                       | রচনা                                                                               |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ১৩২৪        | ভারতী                         | যুদ্ধ-গীতি । স্বরলিপি সহ<br>আহ্বান                                                 |
| ১৩২৫        |                               |                                                                                    |
| বৈশাখ       |                               | উদ্বোধন                                                                            |
| বৈশাখ .     | ঢাকা রিভিউ ও<br>ঢাকা সম্মিলনী | রামপ্রসাদের পদাবলী                                                                 |
| জ্যৈষ্ঠ     | ভারতী                         | সাহারা রাগ । গান<br>অগ্নিপরীক্ষা                                                   |
| আষাঢ়       |                               | স্বাধীন-ত্রিপুরার ঠাকুরগণ                                                          |
| ১৩৩০        |                               |                                                                                    |
| বৈশাখ       |                               | জাতীয় সঙ্গীত । কবিতা                                                              |
| শ্রাবণ      |                               | স্বরসরিৎ । কবিতা                                                                   |
| মাঘ         |                               | প্রভুর দান । স্বরলিপি সহ                                                           |
| ১৩৩১        |                               |                                                                                    |
| জ্যৈষ্ঠ     |                               | অহঙ্কার । কবিতা<br>লাইব্রেরী<br>সত্যাগ্রহ-সেনাপত্য<br>কালের প্রবাহ<br>কালের প্রবাহ |
| শ্রাবণ      |                               | ভূতশুদ্ধি                                                                          |
| ভাদ্র       |                               | তারকেশ্বরে পূজা দেওয়া<br>কালের প্রবাহ                                             |
| আশ্বিন      |                               | নাচঘর<br>কালের প্রবাহ                                                              |
| ১৩৩২        |                               |                                                                                    |
| বৈশাখ-আষাঢ় |                               | অকালে বাসন্তী পূজা<br>কালীপূজায় বলিদান ও বর্তমানে<br>তাহার উপযোগিতা               |

সাল  
১৩৩২

পত্রিকা  
ভারতী

রচনা

গান ও স্বরলিপি : 'চোখের জলের'

নানা কথা : ঢাল ; খাদি-প্রতিষ্ঠান ; খন্দর

ভারত জী-মহামণ্ডল

মাহুষ-গড়া রাজনীতি :

অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতিসভায় অভিভাষণ

প্রাবণ-আশ্বিন

বর্ষামঙ্গল ও শেষবর্ষণ

স্বদেশী সভার সভাপতিত্ব

কার্তিক-পৌষ

কুমার লাইব্রেরীর কুমারগণের প্রতি

বাইবেলের ইন্ডেক্সমান :

কেশবচন্দ্র সেন স্মৃতিসভায় ভাষিত

মাস

বসন্ত পঞ্চমী : খেলায় পূজা ; তারুণ্যের

অভিষেক

মহর্ষি

বড় মামা [ দ্বিজেননাথ ঠাকুর ]

ফাল্গুন

হিরণ্যয়ী দেবী

প্রমিক

রাজায়-প্রজায়

চৈত্র

বাকালী ও বঙ্গভাষা । মেদিনীপুর-শাখা বঙ্গীয়-

সাহিত্য-পরিষদে সভানেত্রীর অভিভাষণ

বৈশাখ

মাদলিক । কবিতা

১৩৩৩

বৈশাখ

ভাষার ডোর । বীরভূমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে

সভানেত্রীর অভিভাষণ

বৈশাখ-আশ্বিন

অপরাজিতা । উপহাস

জ্যৈষ্ঠ

লীলাধারা । কবিতা

জাতীয় জীবন ও সাহিত্য-পরিষদ

রাজায় প্রজায়

আষাঢ়

অরূপ । কবিতা

নানা কথা

প্রাবণ

প্রাবণ । কবিতা

সাহিত্যিকের প্রতি

সংখ্যা ২

সরলা দেবী চৌধুরাণীর রচনাপঞ্জী

১৫৭

সাল

পত্রিকা

রচনা

১৩৩৩

ভারতী

ভাদ্র

আশ্বিন

ননকোঅপারেশনের আদিকর্তা কে ?

ইংরেজ না ভারতবাসী ?

ভারতীয় মহাজাতি-সম্বন্ধ

দুর্গা ও চণ্ডী

শিব-পীতি। স্বরলিপি সহ

আত্মতৃপ্ত। কবিতা

চিরাগের মেলার পথে

1901

July, Journal of the  
Sept. Mahabodhi Society

A Problem of an Indian Girls School\*

## স্বরলিপি

কাফি। ধেমটা

বুঝতে নারি নারী কি চায়

কি চায় গো।

মাঝখানে ছেদ কহিতে কথা

চাইতে চাইতে মুদে পাতা

হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে

আসতে কাছে ফিরে যায় ॥

কথা : অক্ষয়কুমার বড়াল

সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

II    মা -১ মা । রা-রা -জ্ঞা । রা -১ -গা । মা মা -১ I  
      বু ঝ্ তে না রি ০    না ০ ০    রী কি ০

॥

I    পা -১ -১ । -১ -১ ধপা । মা -গা -পা । মপা -জ্ঞা -রা II  
      চা ০ ০    ০ য়্ কি ০ চা ০ য়্    গো ০ ০ ০

II    পা -১ পা । পা পা -ধা । না -১ না । সা সা -১ I  
      মা ঝ্ থা নে ছে দ্ ক ই তে ক থা ০

I    পা -না না । সা -১ রা । সা সা -১ । ধা পা -১ I  
      চা ই তে চা ই তে মু ষে ০    পা তা ০

I    পা -না না । সা -১ রা । সা সা -১ । ধা পমা -গমা I  
      হা স্ তে হা স্ তে কেঁ দে ০    ফে লে ০ ০ ০

I    পধা -গসা গা । ধা পা -ধপা । মা গা -পা । মপা -জ্ঞা -রা II II  
      আ ০ ০ স্ তে কা ছে ০ ০    ফি রে ০    যা ০ ০ য়্